মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

চামটিকা মসজিদ। এটি ভারতের চামচিকা মসজিদের অনুকরণে তৈরি একটি প্রাচীন সৌন্দর্যমন্ডিত মসজিদ। খনিয়া দীঘির কাছে হওয়াতে এটিকে খনিয়া দীঘি মসজিদও বলা হয়ে থাকে। চামটিকা মসজিদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শাহবাজপুরে অবস্থিত। এর দেয়ালের পরিধি এত মোটা যে চৈত্র মাসের প্রচন্ড গরমে এর ভিতরে শীতল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। এর মূল গম্বুজটি অতি সুন্দর। এই মসজিদের পূর্বে ৬০ বিঘা আয়তনের খঞ্জন দিঘী নামে একটি বড় দিঘী রয়েছে যার পাড়ে সিড়ি বাঁধা ঘাট ছিল মুসল্লীদের ওজু করার জন্য।

শাহ মোহাম্মদ মসজিদ। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ; যা ১৬৮০ সালে নির্মিত। মোগল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এই মসজিদটির মূল নাম শাহ মাহমুদ মসজিদ, কিন্তু ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত মুসলিম স্থাপত্যের ক্যাটালগে একে শাহ মোহাম্মদ মসজিদ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। মসজিদটির নির্মাতা বণিক শেখ মাহমুদ এবং তার নামেই মসজিদটির পরিচিতি। শেখ মাহমুদের উত্তরসূরিরা বসবাস করেন মসজিদের পাশেই। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতি এই মসজিদের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট, যার চার কোণায় আট কোণাকৃতির বুরুজ রয়েছে।

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা দরকার ২
তাঁর শৈশবের দিনগুলো ৪
সামাজিক অগ্রগতি সূচক : পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা
সেবায় এগিয়ে বাংলাদেশ ৬
একতাই বল ৭
আহা! বাদল বেলা ৮
অংকুর ১০
বিসিএস লিখিত পরীক্ষা : ৩য় পর্ব ১১
হজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৩
সুলতান স্মরণে ১৫
নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ইতিহাস ১৬
এসডিজি পাইওনিয়ারস : বিশ্বের ১০ নারীর
কাতারে এক বাংলাদেশি ১৮
পড়া মনে রাখার বৈজ্ঞানিক উপায় ১৯
প্রকল্প সংবাদ ২০
ওয়েব ডিজাইন কী? কেন শিখবেন? ২২
যে ৮ কারণে আমড়া খাবেন ২৪
অভ্যাস পরিবর্তনের ১০টি উপায় ২৫
যে চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশে বিদেশি রোগী ২৬
অংকুর ২৭
পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প ২৮
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে
কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় যত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই   সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ
প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক
শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৩৮

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা দরকার

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে মূলত মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে। স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত উপায়ে ও স্বল্প খরচে অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এতে সহায়তা করেছে। এতে সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

কিন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) তুলনামূলভাবে উচ্চাভিলাষী এবং এর অর্জন হবে অনেক দুরূহ কাজ। উপরন্তু বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সংখ্যাতয় রাজনীতি ও ক্রমবর্ধমান সহিংসতাসহ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই গতানুগতিক পদ্ধতিতে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে না

এসডিজির স্থানীয়করণে স্থানীয় সরকার

যদিও এসডিজি প্রণীত হয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, তবু এর অভিষ্টগুলো অর্জিত হতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে, স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সচেষ্ট ও কার্যকর ভূমিকার মধ্যমে। প্রসঙ্গত, আমাদের সংবিধানে [অনুচ্ছেদ ৫৯ (২) (গ)] জনকল্যাণমূলক সরকারি সেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকারকে, বিশেষত জনগণের দোরগোড়ার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদকে।

এসডিজির অন্তত ১২টি অভিষ্টই অর্জিত হতে হবে স্থানীয়ভাবে এবং সমন্বিত উদ্যোগে। স্থানীয় সরকারের মালিকানায় ও নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে। তাই বাংলাদেশকে এসডিজি অর্জন করতে হলে এর স্থানীয়করণের কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন হবে শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি, যাতে সাংবিধানিক নির্দেশনা কার্যকর হয়, জনগণ তাদের প্রাপ্য সব সেবা সহজে পায়। এ জন্য আরও প্রয়োজন হবে তৃণমূলের নাগরিক সমাজের সহায়তার অধিক ও স্থানসম্মত সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত ও সোচ্চার করা। স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার, যাতে তারা এসডিজির অভিষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করতে পারে।

অভিষ্ট ১৬-এর আলোকে এসডিজি অর্জন

'অভিষ্ট ১৬ এসডিজির শিরোমণি, এর আলোকে অন্য অভিষ্টগুলো অর্জন করতে হবে। এসডিজির অভিষ্ট ১৬-এর বক্তব্য হলো: 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।'

অভিষ্ট ১৬-এর আলোকে 'কমিউনিটি-চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র মধ্য দিয়ে এমডিজি/এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে দুটি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ও থ্যাপার প্রজেক্ট বাংলাদেশের চারটি জেলার ৬১টি ইউনিয়নে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল মূলত গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন, ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বিকাশ ও জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে একটি সমন্বিত 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র প্রবর্তন, যা বর্তমানে 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত।

এই কর্মসূচির মধ্যমে একদল স্বেচ্ছাব্রতী সৃষ্টি হয়েছে, যারা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত ও গঠনমূলক অংশীদারি তৈরি করছে। একই সঙ্গে তারা স্থানীয় সচেতন ও সংগঠিত নাগরিকদের অংশগ্রহণে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজ' গড়ে তুলেছে। এসডিজির অভিষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ১. স্থানীয় জনগণ, ২. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ৩. তৃণমূলের নাগরিক সমাজ এবং ৪. জনগণের জন্য সরকারি সেবাদানকারী বিভাগের অংশীদারি একটি 'কমিউনিটি চলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র সূচনা হয়েছে।

জনগণের ভূমিকা

কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশ হিসেবে ইউনিয়নের জনগণ, বিশেষত নারী ও তরুণদের উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করে সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যারা এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়।

'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রত্যাশা জাগ্রত করা হয়, যাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে চার দিনের রূপান্তরকারী 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণে অংশ নেয় এবং নাগরিকদের সক্রিয় করে

তাঁর শৈশবের দিনগুলো

তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা নিপীড়ন দেখেছেন। গ্রামের হিন্দু, মুসলমানদের সম্মিলিত সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িকতার। আর পড়শি দরিদ্র মানুষের দুঃখ, কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে।

মধুমতি আর ঘাগোর নদীর তীরে এবং হাওড়-বাঁওড়ের মিলনে গড়ে ওঠা বাংলার অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশে টুঙ্গিপাড় গ্রামটি অবস্থিত। আজ থেকে ছ'শ বছর আগে কবিরত্ন বিজয় গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণ কাব্যে এই ঘাগোর নদীর ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়ে গেছেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামের সারি সারি গাছগুলো ছিল ছবির মতো সাজানো। নদীতে তখন বড় বড় পালতোলা পানশি, কেরায়া নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার চলত। বর্ষায় গ্রামটিকে মনে হতো যেন শিল্পীর আঁকা জলে ভেসে একখণ্ড ছবি।

টুঙ্গিপাড়া তখনো অপরিচিত এলাকা। দু-একটি বনেদী পরিবার এখানে বসবাস শুরু করে। টুঙ্গিপাড়ার একটি বনেদী পরিবারের নাম শেখ পরিবার। এই পরিবারের উত্তরসূরী শেখ পরিবারের সুপরিচিত ব্যক্তি শেখ হামিদ গড়ে তোলেন একটি টিনের ঘর। শেখ হামিদের একমাত্র পুত্র শেখ লুৎফর রহমান একজন সজ্জন ব্যক্তি। গোপালগঞ্জ শহরে সবেমাত্র সরকারি চাকরি গ্রহণ করেছেন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। এদিন শেখ লুৎফর রহমান ও তার সহধর্মিণী সায়রা খাতুনের ঘরে জন্ম নিল একটি ফুটফুটে চেহারার শিশু। বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন খোকা। এই খোকাই হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতির জনক এবং সমগ্র বাঙালির প্রিয় মানুষ। শৈশব-কৈশোরে বাবা-মা তাঁকে আদর করে খোকা বলে ডাকতেন।

বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত টুঙ্গিপাড়ায়। টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই শেখ মুজিবুর রহমান ধন ধান্যে পুষ্প ভরা শস্য শ্যামলা রূপসী বাংলাকে দেখেছেন। তিনি আবহমান বাংলার আলো-বাতাসে লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন। তিনি দোয়েল ও বাবুই পাখি জীবন ভালোবাসতেন। বড়শিতে শালিক ও ময়না পুষতেন। আবার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন বোনদের নিয়ে। পাখি আর জীবজন্তুর প্রতি ছিল গভীর মমতা। মাছরাঙা ডুব দিয়ে কীভাবে মাছ ধরে তাও তিনি খেয়াল করতেন খালের পাড়ে বসে বসে। ফুটবল ছিল তার প্রিয় খেলা।

এভাবে তার শৈশব কেটেছে মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে আর বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে। গ্রামের মাটি আর মানুষ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা নিপীড়ন দেখেছেন। গ্রামের হিন্দু, মুসলমানদের সম্মিলিত সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িকতার। আর পড়শি দরিদ্র মানুষের দুঃখ, কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে। বস্তুতপক্ষে সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোনো শক্তির কাছে–সে যত বড়ই হোক, আত্মসমর্পন করেননি; মাথা নত করেননি।

টুঙ্গিপাড়ার সেই শেখ বাড়ির দক্ষিণে ছিল কাছারি ঘর। এখানেই মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের কাছে ছোট্ট মুজিবের হাতেখড়ি। একটু বড় হলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের গড়া পিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর তিনি বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে পড়াশোনা করেন। ১৯৪২ সালে এসএসসি এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতর অধীনস্থ ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। এ সময়ে শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়। শৈশব থেকেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হামিদ মাস্টার ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। তাঁর এক স্যার তখন গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য একটি সংগঠন করেছিলেন। শেখ মুজিব ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান কর্মী। বাড়ি বাড়ি ধান চাল সংগ্রহ করে ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। একবার অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। সাহসী কিশোর মুজিব সেবার স্কুল ঘর মেরামত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার আদায় করেন। এর কিছুদিন পরে গোপালগঞ্জে সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জীবনে প্রথম গ্রেফতার বরণ করেন। এরপরেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে কখনো আপোষ না করায় অনেকবার কারাবরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ছোটদেরকে ভীষণ ভালোবাসতেন। বচিকাঁচার মেলা ও খেলাঘর ছিল তাঁর প্রিয় সংগঠন। কৈশোরে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কচিকাঁচার আসরে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনটি তিনি কাটিয়েছেন এই সংগঠনের ভাই-বোনদের মাঝে। তাঁর জন্মদিনটিকে এখন আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করি। শিশুদের কাছে দিনটি আনন্দ-খুশির।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভের পর পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বংলাদেশে তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর বেঁচে ছিলেন। মানবতার শত্রু কতিপয় বিপথগামী ঘৃণ্য ঘাতকের দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নামই নয়, একটি দেশের, একটি জাতির রূপকর। যাঁর নেতৃত্বে, যাঁর অসীম ত্যাগ ও সংগ্রামে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের তিনি ছিলেন প্রকৃত বন্ধু। অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা ছিল তাঁর বাংলার জনগণের জন্য। পরিবার পরিজনসহ নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন তিনি বাংলার মাটি ও মানুষের কত আপন ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর টুঙ্গিপাড়াকে পৃথক থানা ঘোষণা করা হয়। গোপালগঞ্জের এই সবুজ শ্যামল টুঙ্গিপাড়াতেই এখন চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আমাদের সেই খোকা।

■ mvBdzj Bmjvg Ry‡qj
B‡ÉdvK 21 AvM+, 2013

এভাবে তার শৈশব কেটেছে মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে আর বর্ষার কাদা পানিতে ভিজে। গ্রামের মাটি আর মানুষ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা নিপীড়ন দেখেছেন। গ্রামের হিন্দু, মুসলমানদের সম্মিলিত সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িকতার। আর পড়শি দরিদ্র মানুষের দুঃখ, কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে। বস্তুতপক্ষে সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোনো শক্তির কাছে–সে যত বড়ই হোক, আত্মসমর্পন করেননি; মাথা নত করেননি।

টুঙ্গিপাড়ার সেই শেখ বাড়ির দক্ষিণে ছিল কাছারি ঘর। এখানেই মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের কাছে ছোট্ট মুজিবের হাতেখড়ি। একটু বড় হলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের গড়া পিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর তিনি বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে পড়াশোনা করেন। ১৯৪২ সালে এসএসসি এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতর অধীনস্থ ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। এ সময়ে শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়। শৈশব থেকেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হামিদ মাস্টার ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। তাঁর এক স্যার তখন গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য একটি সংগঠন করেছিলেন। শেখ মুজিব ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান কর্মী। বাড়ি বাড়ি ধান চাল সংগ্রহ করে ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। একবার অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। সাহসী কিশোর মুজিব সেবার স্কুল ঘর মেরামত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার আদায় করেন। এর কিছুদিন পরে গোপালগঞ্জে সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জীবনে প্রথম গ্রেফতার বরণ করেন। এরপরেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে কখনো আপোষ না করায় অনেকবার কারাবরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ছোটদেরকে ভীষণ ভালোবাসতেন। বচিকাঁচার মেলা ও খেলাঘর ছিল তাঁর প্রিয় সংগঠন। কৈশোরে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কচিকাঁচার আসরে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনটি তিনি কাটিয়েছেন এই সংগঠনের ভাই-বোনদের মাঝে। তাঁর জন্মদিনটিকে এখন আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করি। শিশুদের কাছে দিনটি আনন্দ-খুশির।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভের পর পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বংলাদেশে তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর বেঁচে ছিলেন। মানবতার শত্রু কতিপয় বিপথগামী ঘৃণ্য ঘাতকের দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নামই নয়, একটি দেশের, একটি জাতির রূপকর। যাঁর নেতৃত্বে, যাঁর অসীম ত্যাগ ও সংগ্রামে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের তিনি ছিলেন প্রকৃত বন্ধু। অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা ছিল তাঁর বাংলার জনগণের জন্য। পরিবার পরিজনসহ নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন তিনি বাংলার মাটি ও মানুষের কত আপন ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর টুঙ্গিপাড়াকে পৃথক থানা ঘোষণা করা হয়। গোপালগঞ্জের এই সবুজ শ্যামল টুঙ্গিপাড়াতেই এখন চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আমাদের সেই খোকা।

■ mvBdzj Bmjvg Ry‡qj
B‡ÉdvK 21 AvM+, 2013

সামাজিক অগ্রগতি সূচক পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে বাংলাদেশ

➡ In South Asia, Bangladesh is ahead of India and Pakistan in nutrition & basic medical care, personal safety

➡ Bangladesh is an under-performer in components of personal rights, tolerance and inclusion

➡ Despite the success, Bangladesh ranked 101st among 133 countries because of weak performance in other components

পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য এই তিন মাপকাঠিতে ২০১৬ সালের যে দেশগুলো ভালো করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে রয়েছে। সামাজিক অগ্রগতি সূচক নিয়ে ১৩৩টি দেশের ওপর পরিচালিত সোশ্যাল প্রোগ্রেস রিপোর্ট-এ এই তথ্য উঠে এসেছে।

তবে ১২টি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে নয়টিতে ভালো করতে না পারায় '৫৭ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে 'স্বল্প সামাজিক অগ্রগতির দেশে'র তালিকায় ১০১তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান যথাক্রমে ৯৮ ও ১১৩তম অবস্থানে রয়েছে। প্রাথমিক জ্ঞানার্জন, তথ্য ও যোগাযোগের সুযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইমপারেটিভ এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

৯০.০৯ পয়েন্ট পেয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যান্ড। এরপর রয়েছে কানাডা, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া এবং সুইজারল্যান্ড। তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র ১৯তম অবস্থানে রয়েছে।

মৌলিক মানবিক চাহিদা, জনকল্যাণ এবং সুযোগ–এই তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে সামাজিক অগ্রগতি সূচক তৈরি করা হয়েছে। এই প্রধান বিষয়গুলোর আওতায় আবার ১২টি অংশ রয়েছে। এগুলো হলো: পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, আশ্রয়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ, তথ্য ও যোগাযোগের সুযোগ, স্বাস্থ্য, পরিবেশের মান, ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পছন্দ, ধৈর্য ও অন্তর্ভুক্তি এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ।

গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী, মৌলিক মানবিক চাহিদার বিবেচনায় পুষ্টি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় বাংলাদেশ ভালো করেছে। এছাড়াও, জনগণের জন্য আশ্রয় নিশ্চিত করার বিষয়ে অনেক সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে। জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টিতে। কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে পরিবেশের মানের ক্ষেত্রে।

পুষ্টি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় যে অল্প কয়েকটি দেশ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভালো করেছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জাপান ও ইতালি।

তালিকায় ৮৩তম অবস্থানে থেকে শ্রীলঙ্কা 'নিম্নমধ্য সামাজিক অগ্রগতির দেশ'-এর তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে ১৩২তম হয়ে আফগানিস্তান রয়েছে 'অতি স্বল্প সামাজিক অগ্রগতি'-র দেশের তালিকায়।

এই তালিকা প্রকাশের বিষয়ে সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইমপারেটিভ-এর নির্বাহী পরিচালক মাইকেল প্রিন মন্তব্য করেন, 'সামাজিক অগ্রগতির সূচক প্রমাণ করে যে জিডিপি-ই সব নয়।'

॥ স্টার অনলাইন রিপোর্ট
জানুয়ারি ০৪, ২০১৭

একতাই বল

'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' এ কথা বহুদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ। সকলে মিলে মিশে কোনো কাজ করলে তাতে সফলতা আসবেই। যদি সে কাজ সফল না হয় তার জন্য কাউকে একক ভাবে দুঃখিত কিংবা লজ্জিত হতে হয় না। সফলতা যেমন সকলের, ব্যর্থতাও তেমন সবার। আমরা সকলেই এই গল্পটা জানি–এক বৃদ্ধ তার মরণকালে তার দশ ছেলেকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাঠি দিয়ে বললেন এটি ভাঙ্ত তো। প্রত্যেক খুব সহজে এক একটি লাঠি ভেঙ্গে ফেলল। এরপর বৃদ্ধ দশটি লাঠি একত্রে করে আঁটি বেঁধে প্রত্যেককে বললেন, এবার এই আঁটি ভাঙ্ত তো। কেউ সে আঁটি ভাঙ্তে পারল না। তখন বৃদ্ধ বললেন, বাবা সকল! সবসময় তোমরা যদি এই আটিটির লাঠিগুলোর মতো একত্রে থাক তাহলে কেউ তোমাদের ভাঙ্তে বা ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তোমরা একেকজন আলাদা হয়ে যাও তাহলে তোমাদের অনৈক্যের সুযোগে অন্যেরা তোমাদের একেকজনের ক্ষতি সহজে করতে পারবে। সে জন্য কথায় বলে একতাই বল। ইংরেজিতে একটি চমৎকার প্রবাদ বাক্য আছে 'United we stand, devided we fall'. একতার বলে আমরা দাঁড়াই, বিভক্তিতে ঘটে আমাদের পতন। একথা সকল ক্ষেত্রে খাটে। যে-কোনো কাজে, যে-কোনো ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নাই। যে-কোনো কঠিন কাজ হোক না কেনো সকলে মিলেমিশে বুদ্ধি খাটিয়ে শক্তি দিয়ে করলে তা সমাধা করা সহজতর হয়।

এই সমাজে বা সংসারে কেউ একা একা কিছু করতে পারে না। আমরা প্রত্যেকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আমার যা আছে আরেকজনের হয়তো তা নেই–আবার অন্যের যে শক্তি, দক্ষতা ও সামর্থ আছে আমার হয়তো সেটি পুরোপুটি নেই–তাই আমাদেরকে অবশ্যই সামর্থের ভাগাভাগি করতে হবে। দুই দুইয়ে যেমন চার হয় তেমনি আমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তি একেকজনের একক শক্তি ও সামর্থের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। দেশের যে-কোনো বড় ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এখানে ঐক্যের ব্যাপারটি বেশ বড়। লাঠিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তা ভাঙ্গা যেমন সহজ হয়েছিল তেমনি দেশের সব সমস্যা মোকাবেলায় দেশবাসী যদি ঐকবদ্ধ হয় তা হলে তা মোকাবেলা করা সহজ হয়। বরং পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য, একে অন্যের ওপর দোষারোপ ও নির্ভরশীলতার সমস্যার সমাধান শুধু কঠিনই হয় না সমস্যা আরো বাড়ে বৈকি কেননা অনৈক্যের মধ্যেই সে সমস্যা আরো বাড়ার সুযোগ পায়, সমস্যা সম্প্রসারিত হয়। বড় কিছু অর্জন করতে হলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন, সকলের বুদ্ধি পরামর্শ ও অংশগ্রহণ আবশ্যক। আর সকলের সজাগ দৃষ্টিতে সকল ভুল ও সমস্যা সহজে দূর করা সম্ভব হয়। ইতিহাসে বহু প্রমাণ আছে কোনো দেশে যদি জনগণের মধ্যে একতার অভাব দেখা দেয়, তখন নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে একে অন্যের ওপর। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ ঘটিয়েই সড় বড় সংসারে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং সংসার ভাঙার সে সুযোগ গ্রহণ করে বাইরের কোনো ষড়যন্ত্রকারী।

ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকা, মৌমাছি এরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে চলাচল করে খাদ্যসংগ্রহ করে। কোনো খাদ্যের সন্ধান পেলে কাক তারস্বরে অন্য কাকগুলোকে ডাকে। আবার একটি কাক যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে ডাকাডাকি করে সব কাক একত্রে সমস্বরে তার প্রতি সমবেদনা জানায়। এসবই একতাবদ্ধ থাকার প্রেরণা থেকে। বনের পশুপাখিরাও প্রতিকূল পরিবেশে একত্রে সহাবস্থান করে নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে।

মানুষ সংসারে নানান উপায় ও উপলক্ষে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। পরিবার ভাইবোন পিতামাতা সকলে একত্রের বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে, মেসে বা হলে রুমমেট বা কক্ষ সাথীর সাথে, চাকরিতে ব্যাচমেট, প্রবাসে জেলাবাসী ও এলাকাবাসী হিসেবে সমিতি করে। তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়। উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী শিল্প কারখানার মালিক শ্রমিক সবাই সমিতি গঠনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ও উন্নয়নে সকলে সম্মিলিতপ্রবে সজাগ, সোচ্চার ও সক্রিয় হতে চায়। জাতিসংঘ সবল ও দুর্বল সব রাষ্ট্রেরই সংঘবদ্ধ সংস্থা। বিচ্ছিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলো এখন ইউনিয়নভুক্ত হয়ে শক্তিশালী ইউরোপ গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যেকের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে। প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এ উপলব্ধি সবার মধ্যে থাকা জরুরি। নিজের শক্তি সামর্থ ভাগাভাগিতে সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে একতা গড়ে উঠবে না। সকলের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে তা সমাধানে সকলকে ব্রতী হতে হয়। এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ হয়তো কিছুটা ছেড়ে দিতে হতে পারে। শুধু নিজের লাভের চিন্তা এখানে অত্যন্ত বেমানান। বড় কিছু অর্জন করতে হলে, বৃহত্তের ঐকের স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধকে উৎসর্গ করতে হয়। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টায় অনেক কঠিন কাজ সহজে করা সম্ভব। সে উদ্দেশ্য সাধনে নিজের আত্মত্যাগও জরুরি।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব, ইআরডি ও চেয়ারম্যান এনবিআর
মেম্বার, গভর্নিং বোর্ড, এইচডিএফ

আহা! বাদল বেলা

'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'...এই গানগুলো আমরা গুণগুণ করে গেয়ে উঠি বর্ষা এলেই। টিনের চালায় ঝুমঝুম বৃষ্টি এরই নামই তো বর্ষা। কদম, কেয়া আর কেতকীর নয়নাভিরাম রূপের পসরা নিয়ে আবারও হাজির হলো বর্ষা ঋতু। গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহের পর অনাবিল প্রশান্তির পরশ নিয়ে আসে বর্ষা।

বর্ষার আগমনে শুষ্ক তাপদাহে নাকাল প্রকৃতি আকাশের কান্নার শীতল পানিতে সবুজ সতেজ হয়ে উঠবে। ব্যস্ত নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে একটু ব্যাঘাত ঘটালেও বর্ষা ঋতুর প্রাকৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হতেই হয় বাঙালি গ্রাম কিংবা নগরবাসীকে। বৃষ্টির শীতল পরশ ছুঁয়ে যায় সকলের মন-প্রাণ। সকল আগল খুলে মনের আকুলতা প্রকাশ করারও দারুণ সুযোগ এনে দেয় বর্ষা।

বর্ষার প্রথমদিনে বংলার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কালো মেঘে ঢাকা সূর্যও যেন বর্ষাকে বরণ করে নিয়েছে। এমন মুখর পদধ্বনি, এমন গম্ভীর প্রকাশ বার্তা আর কোনো ঋতুর নেই। তাই বসন্তকে যদি ঋতুরাজ বলা যায় তাহলে বর্ষা হলো ঋতুরাণী। আষাঢ়ের নবীন মেঘের আগমন যেন নব পথিকের মতো। সে আসে যেমন নবীনের অভিনবত্ব নিয়ে তেমনি আসে পুরাতনের পুঞ্জিভূত রূপ নিয়ে। তাই সে কখনও চির নতুন আবার কখনও চির পুরাতন।

সেই আদি-অনন্তকাল থেকেই আষাঢ়ের এই রূপ বাংলার প্রকৃতির কাছে চিরচেনা। ভূমুল বৃষ্টিধারা, নদীমাতৃক দেশের নদীর পূর্ণ যৌবন, নদীকূলের ভাঙাগড়া সবই বাঙালির রক্তের সঙ্গে যেন মিশে আছে। যাই হোক, আষাঢ় আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। কেননা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ফসলের জমি ফেটে চৌচির হয়ে

যায়। তখনই বৃষ্টিধারা কৃষি জমিকে চাষযোগ্য করতে, মাটিকে নরম করে আবাদযোগ্য করতে নেমে আসে আকাশ থেকে। কৃষকের মুখে ফোটে আনন্দের হাসি। বাংলার প্রকৃতির এই সবুজ-শ্যামল রূপ তা তো বর্ষারই দান। বাংলার চিরচেনা সবুজ রূপকে সত্যি করতে আর কৃষকের ফসল বোনার স্বপ্নকে সফল করতেই বর্ষা আসে এ ঋতুতে আরও ফোটে কত ফুল। কদম, কেয়া, খাল-বিলে শাপলা, শালুক আরও নাম না জানা কত ফুল। এছাড়া কদমফুলের চোখ জুড়ানো শোভা ও পেখম খোলা ময়ূরের উচ্ছল নৃত্যের অনুষঙ্গ থাকে এই আষাঢ়ে। একটা সময় ছিল যখন গ্রামের দামাল শিশুরা মাঠে-ঘাটে তুলত শাপলা-শালুক। নদীতে জেলেরা দল বেঁধে মাছ ধরতে যেত। হয়তো নগর সভ্যতার তাণ্ডবে হারিয়ে গেছে আজ তার অনেক কিছুই। তবে আজও সেদিনগুলো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি আবহমান গ্রাম বাংলা থেকে।

এই বর্ষার আগমনে প্রেমিক কবিরাও আবহমানকাল ধরেই উচ্ছ্বসিত–বিচলিত। বাঙালি কবিদের প্রিয় ঋতু বলতে বর্ষা। 'মেঘদূত'-এর মহাকবি কালিদাস তো এই আষাঢ়ের প্রথম দিবসেই বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে সুদূর দুর্গম কৈলাস শিখরে পাঠিয়েছিলেন বিরহিণী প্রিয়ার কাছে। তিনি এই আষাঢ়েই চিরয়ত কাব্যগ্রন্থ মেঘদূত রচনা করেন। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ আষাঢ়কে বলেছেন 'ধ্যানমগ্ন বাউল-সুখের বাঁশি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সম্ভারেও বর্ষা দখল করে আছে উল্লেখযোগ্য স্থান। বর্ষা ছিল কবির একটি প্রিয় ঋতু। তাই তার বিভিন্ন গানে উঠে এসেছে মেঘ-মেদুর বর্ষার রূপ ঐশ্বর্যের শিল্পীত বর্ণনা। তিনি লিখেছেন–'বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা। তোমার শ্যামল শোভা বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা। তোমার মন্ত্রবলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে। মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফলের ডালা' অথবা 'বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর, আউশের ক্ষেত জলে ভরভর, কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে। ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে'। বিশ্বকবির এই শাশ্বত পঙক্তিযুগলের ছন্দের মতো ঝরঝর বর্ষণ কাল হবে কি-না কারও জানা নেই। তবে কবির এমনই আহ্বানের মতো দেশবাসীরও আশা বর্ষার আগমনে তাপিত গ্রীষ্মের দীর্ঘ অধ্যায়ের অবসান হবে।

বাঙালির অতি প্রিয় এই ঋতুর আগমনে পুরো প্রকৃতি তার রূপ ও বর্ণ বদলে ফেলে। গাছপালা, তরুলতা সবকিছুই যেন গ্রীষ্মের দহন থেকে পরিতৃপ্তি পেতে স্নান করে ওঠে। কবিগুরুর কাব্যভাণ্ডারের বহু ছত্রে কেবল বর্ষা আহ্বানের পঙক্তি–'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে, আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে' কিংবা 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগন, তিল ঠাঁই আর নাহিরে'।

বর্ষা নিয়ে নবযৌবন আর যৌবনের কবিদের অমরগাঁথা থাকলেও একে নিয়ে আবার অনুযোগেরও কমতি নেই। কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় যাদের আগ্রহ কম তাদের অনেকের কাছে বর্ষা ভোগান্তিরও বটে। কেননা আষাঢ় মানেই বৃষ্টির ঘনঘটা। বৃষ্টির তোড়ে যাওয়া যায় না ঘরের বাইরে। বিশেষ করে নগরে রাস্তায় বের হওয়া অনেক সময়ে চরম দুর্ভোগই নিয়ে আসে। কমে যায় দিনমজুরের আয়-উপার্জন। গ্রামাঞ্চলেও অনেক সময়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তবে বর্ষা নিয়ে যাই

বলুক আর যাই ঘটুক প্রকৃতির গভীর আহ্বান ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় করেই চলছে বাঙালি মনন।

চিরকালই বর্ষাঋতুর আগমন এই দেশের প্রকৃতিকে বদলে দেয় নানারূপে, নানা চিত্রধারায়। নদ-নদীতে বাড়তে থাকে জলের ধারা। খাল-বিলে ফিরে আসে চিরচেনা রূপের বহর। মৌসুমী বায়ুর বহতায় প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়ে দেয় শীতল বাতাস আর বৃষ্টিমাখা বায়ুস্তর। প্রাণান্ত শান্তির পরশ ফিরে আসে সামাজিক জীবনে। এছাড়া কেতকীর মনমাতানো সুগন্ধ, কদমফুলের চোখ জুড়ানো শোভা ও পেখম খোলা ময়ূরের উচ্ছল নৃত্যের ছন্দ থাকে এই আষাঢ়েই।

দেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বর্ষাকে নিয়ে নানা মিথ। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায় বর্ষাকে বরণ করে ভিন্নমত্রায়। প্রতিবছর তরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে মাসব্যাপী বর্ষাবরণ উৎসবের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ এ বর্ষাবরণ উৎসবে যোগ দেয়।

হঠাৎ বর্ষা যেমন আনন্দের, বর্ষার নির্মম নৃত্য তেমনি হঠাৎ বিষাদে ভরিয়ে তোলে জনপদ। তবুও বর্ষা বাঙালি জীবনে নতুনের আবাহন। সবুজের সমারোহে, মাটিতে নতুন পলির আস্তরণে আনে জীবনেরই বারতা। সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলা মায়ের নবজন্ম এই বর্ষাতেই। সারাবছরের খাদ্য-শস্য-বীজের উন্মেষ তো ঘটবে বর্ষার ফেলে যাওয়া অফুরন্ত সম্ভাবনার পলিমাটি থেকে।

বর্ষার এমন রূপবৈচিত্র্যে অতি ব্যস্ত নগরীতে শত কাজের ভিড়েও আমরাও হারিয়ে যাই আমাদের সেই প্রাণোচ্ছল শৈশবে, সেইসব দিনগুলোয় যেখানে শুধুই না বলা বর্ণিল স্মৃতিগুলো পরিপাটি করে সাজানো আছে। শেষ বেলায় এসে হয়তো মনে পড়ে যায় রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার গুটিদুয়েক ছন্দ–

'এল-বৃষ্টি বুঝি এল
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।
এল-বৃষ্টি বুঝি এল
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল
এল-বৃষ্টি বুঝি এল
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ঐ চলে যায় কেলো–
এল-বৃষ্টি বুঝি এল
জল ধরে গেলে যদি, তারপর কাঁথাগুলো মেলো'।

■ bvw`qv bvnwib ing
B‡ËdvK 19 Ryb 2015

ও আমার বন্ধু

আদুরী রানী
সদস্য নং ১২১৫/২০১৬

বাগানের পাশে মাটি তোলা জমিটিতে কি জঙ্গল। তার উপর ঘন ঘন বৃষ্টি। জঙ্গল একবারে ঘাস, আগাছা, পোকামাকড়ে ভর্তি হয়েছে। ছাগলটি সেই ঘন্টা খানেক থেকে ডাক ছাড়ছে। জানি না জঙ্গলে তাকে আবার জোঁক ধরছে নাকি।

বাগানের মাঝখানে চাংড়ায় বসে সবগুলো দেখা যায়। দূরে পাওয়ার-টিলারের শব্দ। কলেজ থেকে ফিরে বাগানে ঢুকে বাড়ির ছোট মেয়ে কি যেন করছে। গাছের ডালে ঘুঘু পাখিটা একটু পর পরই আওয়াজ দিচ্ছে।

আজ কাল কেন এমন হয় বোঝাই যায়নি। ছোটকি এসে বলল, দিদি, বড়মা তোকে ডাকছে।

ধ্যাৎ, ভাল্লাগে না। ওঠে এলাম ওখান থেকে। কলেজে ক্লাস রুটিন অনুযায়ী হচ্ছে।

কতদিন ধরে রিয়ার সঙ্গে অপুর দেখা হয়নি। তাই রিয়ার মন খুবই খারাপ।

বারান্দায় চেয়ারে বসে অনেকক্ষণধরে কি যেন ভাবছে রিয়া। হঠাৎ একজন বলল, রিয়াদি তোর পায়ের নিচে দ্যাখ।

ফিরে তাকাতেই দেখি ছোটকি (আমার বোন)। কি রে ছোট কি কি দেখব?

নিচে দ্যাখ–

ওমা এ যে বিড়ালছানা! তুলে নিয়ে একটু আদর করে, ছেড়ে দিলাম। আর তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। নাম দিলাম অপু।

ওদিকে বিড়াল হাতে তোলা দেখে, ছোটমা বলে উঠল ছিঃ রিয়া॥

ধ্যাৎ, ছোটমার আবার কী হলো মনে মনে বললাম।

বাড়িতে বড়মা ও বাকিরা বিড়ালকে অপছন্দ করে। জেঠ মাছ কিনে এনেছিল আর সেই মাছ সম্ভবত বিড়ালছানার মা খেয়েছিল। সেজন্য বড়মা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেদিন থেকেই ওদের সাথে আমার দেখা হয় না। ছোটবেলায় ছানাটির সাথে কত কিছুই না করেছি। কিন্তু ও আর তার মা চলে যাওয়াতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।

বাগানে ছোটকিকে ডেকে আমি সেদিনের একটা কথা বললাম। ও স্কুল থেকে যখন ফিরেছিল।

জানি না বাড়িতে শুনলে অন্যরা কী ভাবত।

সেদিন একটু বাতাসসহ সন্ধ্যা থেকে রাত প্রায় ১২টা অবধি বৃষ্টি হয়েছিল। আমার একটু ঠান্ডা লেগেছিল। তাই পাতলা কম্বলটা একটু গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ, মধ্য রাতে পাশে কি যেন একটা গরম লাগল হাতে। ভয় পেয়ে গেছিলাম। তাড়াহুড়ো করে আলো জ্বালিয়ে দেখি ছোট বিড়ালছানাটি। যাকে আমি খুব ভালোবাসি। ওরও মনে হয় একটু ঠান্ডা লেগেছে। তাই ওকে আমার কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম। সারা রাত লম্বা একটা ঘুম দিলাম। বিড়ালছানাটি রাতে মনে হয় আমাকে একটু কম চিনেছে। তাই সে সেই মিউ শব্দটি করেনি যে শব্দটা শুনলে আমি টের পাই যে অপু এসেছে।

সকালে চোখ না খুলেই দেখি ও নেই। কোথায় গেল। তাড়াহুড়া করে উঠলাম। কোথাও নেই অপু। হয়তো বা চলে গেছে বড়মার ভয়ে।

ওই চলে গেছে আর ফেরেনি। ওকে এখনও আমি খুব মিস করি।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে অপুর কথা ভাবছি ও আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল। হঠাৎ একটা শব্দ হলো 'মিউ'।

সেই চেনা পরিচিত শব্দ। তাকিয়ে দেখি আশেপাশে কেউ নেই। আবার শব্দ হলো মিউ।

আবার পাশ ঘুরে দেখি আমার বন্ধু অপু। ঝোপের কোণে লুকিয়ে। বড়মাকে বোধ হয় দেখেছে তাই অর্ধেক লুকিয়ে আছে।

আমার দুচোখ ছলছল হয়ে উঠল। দু-এক ফোঁটা অশ্রু বেরও হলো।

মনে মনে ভাবলাম কতটা ব্যথা তুমি আমায় দিয়ে চলে গেছিলে।

ও আমাকে দেখে কেঁদেই ফেলেছিল। কিন্তু আমি বললাম কোথায় চলে গেছিলে।

এক বছর পর ওকে দেখে আমার চিনতে একটু সমস্যা হয়েছিল।

কি বড় হয়েছে ও। চেহারাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। যাতে বাড়ির কেউ না দেখে সেজন্য আমি প্রতিদিন ঝোপের কাছে অপুকে খাবার দেই আর ও আমায় প্রতিদিন একটা শব্দ শোনায় মিউ। এর অর্থ বেস্ট ফ্রেন্ড। এটা শুধু ও আর আমি জানি।

পাশের বাড়ির লোকেরা প্রায় বলে অত বড় মেয়ে কলেজে পড়ে এখনও যদি একটু জ্ঞান হয়।

ছোটকি বলে, ও এরকমই
সবার থেকে আলাদা।

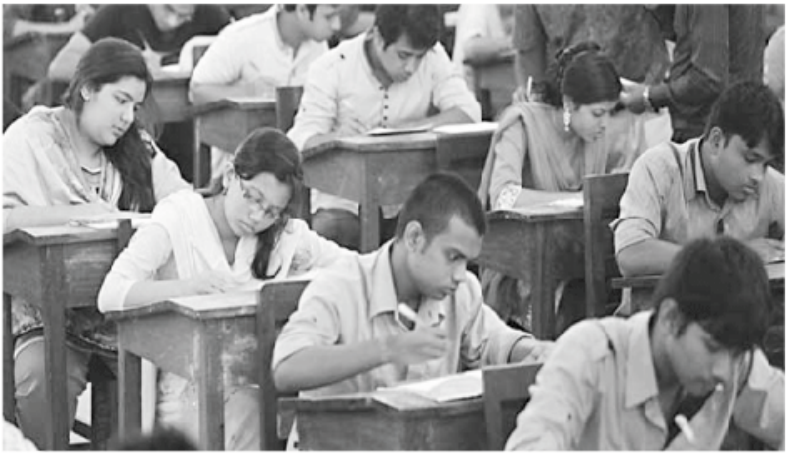

বিসিএস লিখিত পরীক্ষা : ৩য় পর্ব

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার নানা কলাকৌশল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দিচ্ছেন বিগত পরীক্ষার শীর্ষ মেধাবীরা। এ পর্বে সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে লিখেছেন ৩৩তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে প্রথম ও সম্মিলিত মেধায় পঞ্চম অভিজিৎ বসাক

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মোট বরাদ্দ ১০০ নম্বর

এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারলে গণিতের মতোই ভালো নম্বর তুলতে পারবেন।

প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃত না করে প্রয়োজনীয় চিত্র, উদাহরণ, রাসায়নিক সংকেত ও চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। প্রথমেই সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ভালোমতো দেখে নিতে হবে। বিগত বছরের প্রশ্নের ধরন দেখলে ঠিক কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়, সে সম্পর্কে আপনার ভালো একটি ধারণা হয়ে যাবে।

আমরা নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে বইগুলো পড়ে এসেছি, ওই বইগুলো থেকেই সিলেবাসের বেশির ভাগ টপিক খুঁজে পাবেন। কিছু টপিক খুঁজে না পেলে রেফারেন্স অথবা গাইড বই কিংবা ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারেন। বিগত বছরের প্রশ্ন লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, কিছু কমন ও গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকেই বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয়। প্রথমে এ টপিকগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, চিত্র, সংকেত–এগুলোর একটা তালিকা করে ফেলুন। এরপর এই গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো ভালোমতো পড়া শেষ হলে বাকি টপিকগুলো পড়তে শুরু করবেন।

আলো, শব্দ, চুম্বকত্ব

এ বিষয়গুলো নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ে পেয়ে যাবেন। প্রথমেই বেসিক বিষয়গুলো ভালোমতো শিখে নিতে হবে। তাহলে

বিজ্ঞান পড়তে চাপ তো লাগবেই না, বরং মজা পাবেন বইতে সুন্দর একটি চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গগুলো দেখানো হয়েছে। এই একটি চিত্র বুঝতে পারলেই আলোর বিভিন্ন রং, আলোর বর্ণালি, তড়িৎ-চুম্বক বর্ণালিসহ আরো অনেক বিষয় শিখে নিতে পারবেন। আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করি। এক্স-রে, মাইক্রোওয়েভ ওভেন–এগুলোও আলোর মতো এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকতরঙ্গ ছড়া কিছুই নয়। পার্থক্য শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। শব্দও এক ধরনের তরঙ্গ। তবে এটি অণুদৈর্ঘ্যতরঙ্গ। এই তরঙ্গগুলোর কম্পাঙ্ক, তরঙ্গদৈর্ঘ্য উল্লেখ করে উত্তর দিতে হবে। আর সঙ্গে চিত্র ব্যবহার করতে হবে। মাথায় রাখবেন, উত্তরের শুরুটা যেন সুন্দর আর তথ্যভিত্তিক হয়।

এসিড, ক্ষার, লবণ ও পানি

এই টপিকগুলো শুরু করার আগে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবই (রসায়ন) থেকে অণু, পরমাণু ও আয়ন সম্পর্কে ভালোমতো শিখে নিতে হবে। সঙ্গে নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বইটাও দেখতে হবে। তাহলে অর্ধেক চাপ এখানেই শেষ হয়ে যাবে। বই থেকে পানির গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, কোনটার pH কত, পানিদূষণের কারণ-প্রভাব এই টাইপের বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে শিখে নেবেন। বর্ণনামূলক উত্তর না দিয়ে তথ্যভিত্তিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

খাদ্য ও পুষ্টি

এ টপিকগুলোতে যতটা সম্ভব উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজন হলে চিত্র ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য ও পুষ্টি অংশটুকু নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বই থেকে শিখতে পারেন। ভিটামিন বা আমিষের অভাবে কী কী রোগ হয়, কোন খাদ্যে কোন উপাদানের পরিমাণ কতটুকু, দৈনিক কী পরিমাণ ফল খাওয়া উচিত–প্রয়োজন অনুসারে এসব তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, বায়ুমণ্ডল

প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, বায়ুমণ্ডলসংক্রান্ত বিষয়গুলো নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল বইয়ে ও সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ে পেয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়ে নিতে হবে। সঙ্গে যেকোনো গাইড বই দেখতে পারেন। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের নাম, উচ্চতা, উপাদান, কোন স্তরের ভূমিকা এ তথ্যগুলো দিয়ে উত্তর করলে অবশ্যই ভালো মার্ক পাওয়া যাবে।

বায়োটেকনোলজি, রোগ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বায়োটেকনোলজি অংশটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বই মিলিয়ে পড়লে ভিটেইল পাবেন। এর মধ্যে বেশিরভাগ টপিকই বংশগতি বিজ্ঞান নিয়ে। DNA, RNA বা ক্রোমোজম বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে চিত্র ও রাসায়নিক সংকেতসহ দিতে হবে। উত্তরের শুরুর অংশে DNA-এর আবিষ্কারক, কত সালে আবিষ্কার করা হয়, এ ধরনের তথ্যভিত্তিক জিনিস দিয়ে শুরু করবেন। DNA, RNA, ভাইরাসগুলোর নাম, কোন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কারণে কোন রোগ হয়–এগুলো উদাহরণসহ দিতে হবে। কোন কোন কাজে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার রয়েছে–এগুলো পয়েন্ট আকারে দিতে হবে।

কম্পিউটার প্রযুক্তি

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ টপিকগুলো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি বই থেকে শিখবেন। বিভিন্ন অংশের কাজ পয়েন্ট আকারে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে চিত্র ব্যবহার করবেন।

তথ্য-প্রযুক্তি

ডাটা কমিউনিকেশন, ডাটাবেজ সফটওয়্যার, LAN, MAN, WAN নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি বইতে সুন্দর করে লেখা আছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারের দায়িত্ব, ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ব্লগের মতো টপিকগুলো মজা নিয়ে শিখবেন। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য চার্ট করে ফেলবেন। তাহলে মনে রাখতে সুবিধা হবে।

ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তি

এ অংশটা একটু বড়। তবে পরিকল্পনা করে পড়লে সময়ের মধ্যেই শেষ করতে পারবেন। ও'হমের সূত্র, কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র, কার্শফের তড়িৎ প্রবাহের সূত্র–এ সূত্রগুলো খাতায় একসঙ্গে লিখে শিখে ফেলবেন। ইলেকট্রনিক ডিভাইস, রোধ, ক্যাপাসিটর, আইসি, সেমিকন্ডাক্টর, টেলিভিশন, রাডার–এ ধরনের জিনিসের সঙ্গে একটির অন্যটির সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো একসঙ্গে পড়বেন এবং কাজ, গুরুত্ব ইত্যাদি পয়েন্ট আকারে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এ টপিকগুলো নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবই (পদার্থবিজ্ঞান) থেকে পড়তে হবে এবং সঙ্গে নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বইটাও দেখতে হবে।

সময় ও নম্বর অনুযায়ী বিভিন্ন টপিক ভাগ করে নেবেন। পরীক্ষার আগে কোনোভাবেই অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে শুধু পড়া ও লেখার অনুশীলন করে যান। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। সফলতা আসবেই।

হজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইন্নাদিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা এই ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। হজ হচ্ছে পাঁচটি ভিত্তির একটি। যা শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। আমরা কেন হজ করি, হজ কিভাবে মানুষের প্রতি, কি কারণে ফরজ হলো এ ব্যাপারে মানুষেরই জানা-অজানা বিষয়গুলো হজের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হলো :

হজ কি?

হজ মানে হচ্ছে সংকল্প করা, পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে হজের মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ জিয়ারত ও বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাই হচ্ছে হজ। (কাওয়াইদুল ফিকহ)

হজের পটভূমি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : হজের ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং এর প্রতিটি কাজ ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত ও তাৎপর্যপূর্ণ।

১. হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও হজরত হাওয়া আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আসার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একে অপরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁরা আরাফাতের ময়দানে পরস্পর মিলিত হন। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সমগ্র পৃথিবী থেকে বনী আদম প্রতি বছর আরাফাতের মহামিলন প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে রোনাজারি, কান্নাকাটি করে তাদের হৃদয় ও মন দিয়ে আল্লাহকে উপলব্ধি করার প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করেন। আর তা করা হয় ৯ই জিলহজ দুপুরের পর থেকে ১০ই জিলহজ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে-কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবস্থানই হলো হজের রুকন।

২. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা এবং তাঁদের পুণ্যবান সন্তান হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর দ্বারা প্রচলিত আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত সাঈ, মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ এবং কুরবানি আদায় করা। এভাবে হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সর্বযুগের আল্লাহপ্রেমিক, আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ নাবী-রাসূলগণসহ সব অলী-আবদাল তথা আল্লাহর নেককার, সত্যপ্রাণ ও মাকবুল বান্দাগণের পরম ব্যাকুলতার সঙ্গে আল্লাহর ঘরে হাজিরা দেয়ার মাধ্যমে রচিত হয়েছে হজ ও জিয়ারাতের সুবিশাল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হজরত আদম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ শরীফে হজ আদায় করেন। পর্যায়ক্রমে হজরত নূহ আলাইহিস সালামসহ অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণ বাইতুল্লাহ জিয়ারত ও তাওয়াফ করেছেন। (আখবারে মক্কা)

হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, বাইতুল্লাহ পুনঃনির্মাণের পর হজরত জিব্রিল আলাইহিস সালাম এই ঘরকে তাওয়াফ ও হজ করার জন্য হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বলেন। এ নির্দেশ পেয়ে হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম উভয়েই তাওয়াফসহ হজের যাবতীয় কার্মকাণ্ড সমাধা করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য হজের ঘোষণা ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। কুরআনের ঘোষণাটি এই :

এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীনকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে। (সূরা হজ : আয়াত ২৭)

তখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে একটি উঁচু স্থানে আরোহন করলেন এবং ডানে-বামে, পূর্ব-পশ্চিমে ফিরে হজের ঘোষণা করে বললেন :

আইয়ুহান্নাসু কুতিবা আলাইকুমুল হাজ্জু ইলাল বাইতিল আতিক্বি ফাআজিবু রাব্বাকুমদ হে লোকসব! বাইতুল্লাহ শরীফের হজ তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও।

হজরত ইবারাহিম আলাইহিস সালামের এ আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে যাদের হজ নসিব হয়েছে, তারা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, হাজির হে আল্লাহ! আমার সবাই হাজির বলেছে। যার যতবার নসিব হয়েছে ততবার হজ পালনে সাড়া দিয়েছে। এভাবে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পর যত নাবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা সবাই বাইতুল্লাহ জিয়ারত করেছেন এবং হজ পালন করেছেন। (আখবারে মক্কা)

হজ ফরজে আল্লাহর বাণী :

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য আবশ্যক কর্তব্য। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত ৯৭) উপরোক্ত বিষয়াবলীর আলোকে হজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বুকে ধারন করে হজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পালন করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে এগিয়ে যাব। অপর অক্ষম, দুর্বল হাজিদেরকে কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সহযোগিতা করব। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

■ জাগোনিউজ২৪.কম, ২৩ আগস্ট ২০১৫

সুলতান স্মরণে

এস এম সুলতানের ৯২তম জন্মবার্ষিকী আজ ১০ আগস্ট। বরেণ্য এই চিত্রশিল্পীকে স্মরণে আজ বুধবার নড়াইলে আয়োজিত হচ্ছে নানামাত্রিক অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসন ও এস এম সুলতান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শিল্পীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কোরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা। এ ছাড়া আগামী ২৯ আগস্ট শুরু হবে তিন দিনব্যাপী সুলতান উৎসব। আর উৎসবের শেষ দিনে ১ সেপ্টেম্বর চিত্রা নদীতে অনুষ্ঠিত হবে নৌকাবাইচ।

১৯২৪ সালের আজকের এই দিনে তৎকালীন নড়াইল মহকুমার মাছিমদিয়া গ্রামে মেছের আলী-মাজু বিবি দম্পতির ঘর আলো করে আসেন এস এম সুলতান। মা-বাবা আদর করে নাম রেখেছিলেন লালমিয়া। এস এম সুলতান ১৯২৮ সালে নড়াইল আশ্রম স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। স্কুলের অবসরে রাজমিস্ত্রি বাবাকে কাজে সহায়তা করার সময় ছবি আঁকতে শুরু করেন। ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালে ১৯৩৩ সালের কোনো একদিনে নড়াইলের জমিদার ব্যারিস্টার হীরেন রায়ের অমন্ত্রণে স্কুল পরিদর্শনে আসেন রাজনীতিক ও জমিদার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সে সময় তাঁর একটি পোর্ট্রেট আঁকেন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র এস এম সুলতান। তা দেখে মুগ্ধ হন শ্যামাপ্রসাদসহ অন্যরা এবং তাঁরা তাঁকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানান। এরপর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় গিয়ে ছবি আঁকা ও জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন সুলতান। সে সময় চিত্র সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে বাদ সাধে সুলতানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর সুপারিশে একাডেমিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পান সুলতান। নড়াইলের লালমিয়া কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই ডাকনাম ছেড়ে এস এম সুলতান নামে পরিচিত হতে থাকেন।

সুলতান ১৯৪৩ সালে আর্ট স্কুল ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ান এখানে সেখানে। এ সময় কাশীরের পাহাড়ে উপজাতীয়দের সঙ্গে বসবাস এবং জীবন-জীবিকা নিয়ে চিত্রাঙ্কন শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে ভারতের সিমলায় তাঁর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে লাহোরে সুলতানের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চিত্রশিল্পীদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন সুলতান। এরপর ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেও একক ও যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালি, পল ক্লি প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীর ছবির পাশে সুলতানই এশিয়ার একমাত্র শিল্পী, যাঁর ছবি এসব প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

সুলতান জন্মভিটা নড়াইলে ফিরে আসেন ১৯৫৩ সালে। এখানে শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৯ সালের ১০ জুলাই 'দি ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৭ সালে স্থাপিত হয় 'শিশুস্বর্গ'। শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন এই বোহেমিয়ান। শিশুদের নিয়ে চিত্রা নদীতে ঘুরে প্রকৃতির মাঝে বসে ছবি আঁকার জন্য তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ১৯৯২ সালে ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট দ্বিতল নৌকা (গ্রামমাণ শিশুস্বর্গ) নির্মাণ সেই ভালোবাসারই সাক্ষ্য দেয়।

আমাদের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে কিংবদন্তি মহান শিল্পসাধক পুরুষ এস এম সুলতান। শিল্পের প্রতি অনুরাগ, শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ, বন্য জীবজন্তু ও পশুপাখির প্রতি ভালোবাসা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস, ভোগবাদী জীবনের প্রতি অবহেলা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সর্বোপরি চিত্রশিল্পে স্বাতন্ত্র্য তাঁকে নিয়ে গেছে অন্যতম উচ্চতায়। শিল্পী সুলতান তুলির আঁচড়ে সৃষ্টি করেছেন 'পাট কাটা', 'ধান কাটা', 'ধান ঝাড়া', 'জলকে চলা', 'চর দখল', 'গ্রামের খাল', 'মৎস্য শিকার', 'গ্রামের দুপুর', 'নদী পারাপার', 'ধান মাড়াই', 'জমি কর্ষণে যাত্রা', 'মাছ ধরা', 'নদীর ঘাটে', 'ধান ভানা', 'গুণ টানা', 'ফসল কাটার ক্ষণে', 'শরতের গ্রামীণ জীবন', 'শাপলা তোলা'র মতো বিখ্যাত সব ছবি। আর এসব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চিত্রাপাড়ের লালমিয়া হয়ে উঠেছেন দেশ-জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান।

চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি সুলতান বাঁশি বাজাতে পারতেন। পুষতেন সাপসহ বিভিন্ন পশুপাখি। নড়াইলের রাস্তায় কালো গাউন পরে কাঁধে ঝোলা ব্যাগে আড় বাঁশি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আমাদের সবার প্রিয় লালমিয়া। ঝোলা ব্যাগে কখনো বেজি, বিড়াল আবার সাপও থাকতে দেখা গেছে।

চিত্রাপাড়ের লালমিয়া তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন হিসেবে পেয়েছেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার', নিউইয়র্কের বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার থেকে 'ম্যান অব অ্যাচিভমেন্ট' এবং এশিয়া উইক পত্রিকা থেকে 'ম্যান অব এশিয়া' পুরস্কার। এ ছাড়া ১৯৮২ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন তিনি। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের রেসিডেন্ট আর্টিস্ট স্বীকৃতি এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর চিত্রকর্ম নিয়ে অকালপ্রয়াত চিত্রনির্মাতা তারেক মাসুদ তৈরি করেন 'আদমসুরত'। অনন্য প্রতিভাধর এই শিল্পী ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর অসুস্থ অবস্থায় যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে তাঁকে নড়াইলে প্রিয় জন্মভিটাতেই সমাহিত করা হয়।

বিশ্ববরেণ্য এই শিল্পী জীবিত অবস্থায় তেমন মূল্যায়িত না হলেও তাঁর শিল্পকর্মকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখা দরকার। শিল্পীর স্বপ্ন আর কর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি পর্যায়ে আরো জোরালো ও কার্যকর উদ্যোগ দাবি স্থানীয় সুলতানপ্রেমীদের।

॥ কালের কণ্ঠ ১০ আগস্ট ২০১৬

নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রসঙ্গকথা

রোহিঙ্গারা পশ্চি মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী। ধর্মের বিশ্বাসে এরা অধিকাংশই মুসলমান। রাখাইন স্টেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো রোহিঙ্গা। মিয়ানমারের সরকারি হিসেব মতে, প্রায় আট লক্ষ রোহিঙ্গা আরাকানে বসবাস করে। রোহিঙ্গারা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। মিয়ানমার সরকার ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, রোহিঙ্গারা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। ১৩৫টি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মধ্যেও রোহিঙ্গাকে তাদের অধিকার থেকে বিতাড়িত করে রেখেছে। মিয়ানমার সরকারের মতে, রোহিঙ্গারা হলো বাংলাদেশি, যারা বর্তমানে অবৈধভাবে মায়ানমারে বসবাস করছে। যদিও ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। ইতিহাস বলে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে।

মিয়ানমার সরকারের দাবি, রোহিঙ্গারা হলো ভারতীয়, বাঙালি ও চাঁটগাইয়া সেটলার, যাদেরকে ব্রিটিশরা আরাকানে এনেছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, ব্রিটিশরা বার্মায় শাসক হিসেবে আসার কয়েক শতাব্দী আগে হতেই রোহিঙ্গারা আরাকানে পরিচার জাতি হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার না করায় সকল প্রকার নাগরিক ও মৌলিক অধিকার, সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি রোহিঙ্গারা। মিয়ানমারে ভ্রমণ, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য পরিচয়পত্র থাকটা খুব জরুরি বিষয়। কিন্তু মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র ইস্যু করে নাই, ফলে দেশের মধ্যে এমনিতেই পিছিয়ে পড়া রোহিঙ্গারা আরো পিছিয়ে পড়ছে।

মিয়ানমার সরকারের ভূমি ও সম্পত্তি আইন অনুসারে বিদেশীরা কোনো সম্পত্তি ও ভূমি মালিক হতে পারে না। রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সরকারের দৃষ্টিতে অবৈধ অভিবাসী তথা বিদেশি। তাই, রোহিঙ্গারা কোনো ভূমি বা স্থায়ী সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। বর্তমানে যে সকল ভূমিতে রোহিঙ্গারা বসবাস করছে, মিয়ানমার সরকার যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো দখল করে নিতে পারে। মিয়ানমার সরকার আইনের মাধ্যমে রীতিমতো অসহনীয় করে তুলেছে রোহিঙ্গাদের জীবন। রোহিঙ্গারা সরকারি চাকরি করতে পারে না, সরকারি কোনো দপ্তরে রোহিঙ্গারা কোনো সেবা পায় না, ব্যাংকে লেনদেন করতে পারে না, সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করতে পারে না, উপযোগ সেবর (বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি) জন্য আবেদন করতে পারে না, তাই স্বপরিচয়ে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ভর্তি হতে পারে না। প্রায় ৮০% রোহিঙ্গা বাস্তবিক অর্থে অশিক্ষিত। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে

বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন এখন বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রধান শিরোনাম হচ্ছে। আজকের দিনে হৃদয়বিদারক মানবতাবিরোধী, নির্যাতিত, নিপীড়িত, রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠির প্রায় ভুলে যাওয়া ইতিহাসের কিছু তথ্য মানবজাতির বিবেকের কড়া নাড়াতে বিভিন্ন মাধ্যম হতে সংগ্রহ করে তুলে ধরা হলো :

১. ধারণা করা হয় রোহিঙ্গা নামটি এসেছে আরাকানের রাজধানীর নাম ম্রোহং থেকে-ম্রোহং>রোয়াং>রোয়াইঙ্গিয়া>রোহিঙ্গা। তবে মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে ডাকা হতো রোসাং নামে।

২. রোহিঙ্গাদের আবাসভূমি আরাকান ছিল স্বাধীন রাজ্য। ১৭৮৪ সালে বার্মার রাজা বোডপায়া এটি দখল করে বার্মার অধীন করদ রাজ্যে পরিণত করেন।

৩. আরাকান রাজ্যের রাজা বৌদ্ধ হলেও তিনি মুসলমান উপাধি গ্রহণ করতেন। তার মুদ্রাতে ফার্সি ভাষায় লেখা থাকত কালেমা।

৪. আরাকান রাজদরবারে কাজ করতেন অনেক বাঙালি মুসলমান। বাংলার সাথে আরাকানের ছিল গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

৫. ১৪০৬ সালে আরাকান রাজ্যের ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরমিখলা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড়ে পলায়ন করেন। গৌড়ের শাসক জালালুদ্দিন শাহ্ নরমিখলার সাহায্যে ৩০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে বর্মী রাজাকে উৎখাতে সহায়তা করেন। নরমিখলা মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ্ নাম নিয়ে আরাকানের সিংহাসনে আরোহন করেন। ম্রাউক-উ রাজবংশ ১০০ বছর আরাকান শাসন করেছে।

৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল রোসাং রাজদরবার। মহাকবি আলাওল রোসাং দরবারের রাজকবি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—মহাকাব্য পদ্মাবতী। এছাড়া সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী, সয়ফুল মুল্ক, জঙ্গনামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল রোসাং রাজদরবারের আনুকূল্যে।

৭. সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে আগ্রায় আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলে, শাহজাদা সুজা সিংহাসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। খাজুয়ার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে মোগল যুবরাজ শাহ্ সুজা ১৬৫৯ সালে সড়কপথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হয়ে আরাকান রাজ্যে পলায়ন করেন এবং আরাকানে আত্মগোপন করেন। তৎকালীন আরাকানবাসী রোসাং রাজা চন্দ্র সুধর্মা বিশ্বাসঘাতকতা করে শাহ্ সুজা এবং তার পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এর পর আরাকানে যে দীর্ঘমেয়াদী অরাজকতা সৃষ্টি হয় তাঁর অবসান ঘটে বার্মার হাতে আরাকানের স্বাধীনতা হরণের মধ্য দিয়ে।

শেষকথা

মানবতার দিক থেকে মিয়ানমারের সরকার সেনাসদস্য দ্বারা যে নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানুষ, পুরুষ, মহিলাসহ ছোট ছোট বাচ্চাদের যেভাবে হত্যাযোগ্য কার্যক্রম চালাচ্ছে, করছে গণহত্যা। তাঁদেরকে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে আমরা নীরব থাকতে পারি না? মানবতার দিক থেকে তাদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা দেওয়া মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একান্ত কর্তব্য। বুদ্ধদেবের উক্তি মতে-জীব হত্যা মহাপাপ, তবে কী গণহত্যা পাপ নয়? মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী অং সান সুচি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সময় যে কথা বক্তব্যে বলেছিল সেটা কি তাঁর মনে নেই। জাতি, বর্ণ, ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না সকলে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলে চলতে হবে।

সুচি তাহলে কি আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মেরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে? মিয়ানমারের কিছু তথ্য সূত্রে জানা যায়-রোহিঙ্গাদের জিহাদি সশস্ত্র আন্দোলন এই মুহূর্তে মিয়ানমার বার্মিজদের কাছে অখণ্ডতার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মনে হচ্ছে। বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের কোনোভাবেই বিশ্বাস করছে না।

এ কারণেই বার্মাতে অন্যান্য জাতির মুসলমানদের কোনো সমস্যা না হলেও রোহিঙ্গারা অচ্ছুৎ হিসেবে বিবেচিত। এত কিছুর মধ্যেও রোহিঙ্গা সমস্যার একটা সমাধান পেতে হলে মিয়ানমারের তথ্য সূত্রে জানা যায় তাঁদেরকে জিহাদি সংগঠন থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদৌ কি রোহিঙ্গারা জিহাদি সশস্ত্র ব্যবহার করছে! না কি এটা সুচির তালবাহানা? আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিকভাবে এটাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাধান করতে হবে।

॥ এম. সোহেল রানা

দেশের নিউজ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

এসডিজি পাইওনিয়ারস

বিশ্বের ১০ নারীর কাতারে এক বাংলাদেশি

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে অবদান রাখায় 'এসডিজি ২০১৭ পাইওনিয়ারস' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন মাইক্রোসফট বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবির। ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল কমপ্যাক্ট লিডারস সামিট ২০১৭' সম্মেলনে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিভাগে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখায় এ বছর বিশ্বের মোট ১০ জনকে সম্মানজনক এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ইউএন গ্লোবাল ইমপ্যাক্টের প্রধান নির্বাহী এবং নির্বাহী পরিচালক লিজ কিংপো এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তথ্য-প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণে সোনিয়া বশির কবির হলেন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন একজন নারী। ডিজিটাল সাক্ষরতাবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তথ্য-প্রযুক্তিতে নারীদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। নারীদের ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখায় সোনিয়া বশির কবিরকে সম্মাননূচক এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সিঙ্গাপুর সফররত সোনিয়া বশির কবির টেলিফোনে বলেন, 'বাংলাদেশের নারীরা খুবই প্রাণবন্ত ও মেধাবী। তাঁর প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের মতো মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে। জাতিসংঘের গ্লোবাল কমপ্যাক্ট দল ২০১৭ সালের এসডিজি নেতৃত্বদানকারী হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমি প্রযুক্তিতে দেশের নারীদের অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী।'

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য ২০১৫ সালে তিন বছরের জন্য সোনিয়া বশির কবিরকে টেকনোলজি ব্যাংকের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন।

বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজির (বিডব্লিউআইটি) অইস প্রেসিডেন্ট ও সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সোনিয়া বশির কবির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) বিজনেস ও কম্পিউটার সায়েন্স স্কুল ও ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের বোর্ড সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন

॥ ইশতিয়াক মাহমুদ
কালের কণ্ঠ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

পড়া মনে রাখার বৈজ্ঞানিক উপায়

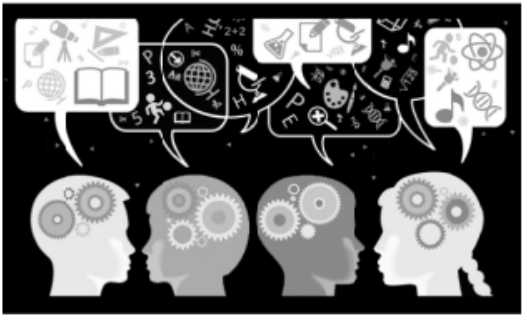

মানুষের মস্তিষ্কের দুটি দিক রয়েছে। একটি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, অন্যটি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের আবার অনেক ভাগ। এর সঙ্গে রয়েছে নানা রকম কাজ। তার একটি হলো মেমোরি বা স্মৃতিশক্তি। পৃথিবীতে বেশি আইকিউ নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। তাদের ব্যবহারিক আচরণের ওপর নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ। যত চর্চা করা যাবে, আইকিউ ততই বাড়বে। সাধারণ আইকিউ ৯০ থেকে ১১০। তবে কারো কারো আইকিউ ১১০-এর ওপরে হতে পারে।

পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির আইকিউ ১১০-এর ওপরে। এ আইকিউ বৃদ্ধির জন্য চর্চার বিকল্প নেই। চর্চার মাধ্যমেই একজন ছাত্র সাধারণ থেকে মেধাবী হতে পারে। মনে রাখতে না পারার ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন—আত্মবিশ্বাসটাই প্রধান: যে-কোনো কাজে সফল হওয়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত হলো আত্মবিশ্বাস। নিজের মনকে বোঝাতে হবে যে, পড়াশোনা অনেক সহজ বিষয়। আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। তাহলে অনেক কঠিন পড়াও সহজ মনে হবে। পড়তে হবে বুঝে-শুনে: একবার পড়েই কোনো বিষয় মনে রাখা সহজ নয়। তাই যে-কোনো বিষয় মুখস্ত করার আগে বিষয়টি কয়েকবার পড়ে বুঝে নিতে হবে। তাহলে সেটা মনে রাখা অনেক সহজ হবে। যেকোনো বিষয়ে ভয় ঢুকে গেলে তা মনে রাখা কঠিন। তাই ভয় না করে প্রথম থেকে বুঝে পড়ার চেষ্টা করলে মনে রাখা কঠিন হবে না। পড়ার পাশাপাশি লেখার অভ্যাস খুবই জরুরি। পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নিতে হবে।

লেখাপড়ার জন্য কোন সময়টা বেছে নিতে হবে, তা একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ রাত জেগে পড়াশোনা করে, কেউ সকালটাকেই মুখ্য সময় হিসেবে বেছে নেয়। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ঘুমের পর ভোরবেলাই পড়াশোনার উপযুক্ত সময় হিসেবে মনে করা হয়।

কৌশল অবলম্বন : পড়া মনে রাখা একটি কৌশল। কোনো একটি পড়া পড়ে নেয়ার পর সাতটি ভাগে ভাগ করতে হয় এবং প্রতিটি ভাগের জন্য এক লাইন করে সারমর্ম লিখতে হয়। ফলে পড়ার বিষয়টি সাতটি লাইনে সীমাবদ্ধ থাকে। এর প্রতিটি লাইন একটি পাতায় লিখে অধ্যায় অনুযায়ী একটি গাছ তৈরি করে গাছের নিচ থেকে ধারাবাহিকভাবে পাতার মতো করে সাজাতে হবে, যাতে এক দৃষ্টিতেই পড়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ মনে পড়ে যায়। এ পাতাগুলোয় চোখ বোলালে লেখা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। বাংলা, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কৌশল অধিক কার্যকর।

পড়তে হবে শব্দ করে : পড়া মনে রাখার এটি একটি কার্যকর পন্থা। উচ্চস্বরে পড়লে শব্দগুলো কানে প্রতিফলন হয়ে তা মস্তিষ্কে সহজেই ধারণ করে। শব্দহীনভাবে পড়া হলে মনের মধ্যে অন্য চিন্তা ঢুকে পড়ে, পড়ার আগ্রহটা কমে যায়। ফলে পড়া মুখস্ত হয় না।

মনে রাখা : সাধারণত মেধাবী ছাত্রদের দেখা যায়, কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে তারা বিভিন্ন বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের মতো করে একটা নোট তৈরি করে। এটা খুবই ভালো পন্থা। এতে ওই বিষয় সম্পর্কে বারবার পড়ার কারণে তাদের নোট তৈরির সময়েই বিষয়টি সম্পর্কে অনেকটা ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়। পরে সেই বিষয়টি মনে রাখতে কোনো কষ্টই হয় না।

ইংরেজির অর্থ জেনে পড়া : ইংরেজি পড় মুখস্ত করার আগে শব্দের অর্থটা জেনে নিতে হবে। অর্থ না জানলে পুরো পড়াটাই বিফলে যাবে। আর সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ্যবইয়ের যেকোনো জায়গা থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থ জানা থাকলে অবশ্যই উত্তর দেয়া যায়।

ইত্তেফাক ১৮ জানুয়ারি ২০১৫

প্রকল্প সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল

২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৫ ব্যাচের ২০ জন সদস্যের মধ্যে ০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ ৫ (A+) পাবার গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী গ্রেড A পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সাফল্যে এইচডিএফ-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন!!

A+ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর
১.	মোছা. তানিয়া তাহিদ তানি (সদস্য নং: ১১৪৯)	৬.	মো. গোলাম রব্বানী (সদস্য নং ১১৮৩)
২.	উম্মে হাবিবা শিয়া (সদস্য নং ১১৫১)	৭.	মোশায়রফ হোসাইন (সদস্য নং ১১৮৫)
৩.	আব্দুল্লাহ সাদমান জামী (সদস্য নং ১১৭৬)	৮.	জোকির হোসেন (সদস্য নং ১১৮৭)
৪.	ইমামুল হোসেন (সদস্য নং ১১৭৭)	৯.	মো. মনিরুজ্জামান খন্দকার (সদস্য নং ১২০১)
৫.	মো. সেফাউল ইসলাম (সদস্য নং ১১৭৯)		

A পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নম্বর
১	নাজনীন লিজা (সদস্য নং ১১৪৬)	১৬	মোছা. হোসনে আরা (সদস্য নং ১১৭১)
২	খাদিজা তুল কুবরা (সদস্য নং ১১৫২)	১৭	নুসরাত জাহান সিঁপি (সদস্য নং ১১৭৪)
৩	সাদিয়া সুলতানা শিমু (সদস্য নং ১১৫৩)	১৮	মো. সোহেল রানা (সদস্য নং ১১৭৮)
৪	মোছা. ফারজানা আক্তার (সদস্য নং ১১৫৪)	১৯	মো. রবিউল ইসলাম (সদস্য নং ১১৮০)
৫	মোছা. লিমা খাতুন (সদস্য নং ১১৫৬)	২০	মো. এনামুল হক (সদস্য নং ১১৮১)
৬	ফাতেমা খাতুন (সদস্য নং ১১৫৭)	২১	মো. আব্দুর রহিম রবিন (সদস্য নং ১১৮২)
৭	ফাতেমা আক্তার (সদস্য নং ১১৫৮)	২২	মো. খাইরুল কাজী (সদস্য নং ১১৮৬)
৮	মোছা. সিনথিয়া নাজনীন (সদস্য নং ১১৫৯)	২৩	মো. আসাদুজ্জামান (সদস্য নং ১১৯০)
৯	মোছা. তাসলিমা সুলতানা (সদস্য নং ১১৬০)	২৪	মো. ইমাম সালমান বাহাদুর (সদস্য নং ১১৯২)
১০	মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস (সদস্য নং ১১৬১)	২৫	পলাশ চন্দ্র রায় (সদস্য নং ১১৯৪)
১১	মোছা. নাজমা খাতুন (সদস্য নং ১১৬৪)	২৬	মো. নাজিম আলী (সদস্য নং ১১৯৬)
১২	মিতালী বিশ্বাস (সদস্য নং ১১৬৫)	২৭	মো. শাদমান সাকিব (সদস্য নং ১১৯৭)
১৩	মোছা. রোকেয়া বেগম (সদস্য নং ১১৬৭)	২৮	মো. মনিরুজ্জামান (সদস্য নং ১২০০)
১৪	শারমিন আক্তার (সদস্য নং ১১৬৮)	২৯	মো. লিমন মিয়া (সদস্য নং ১১৫৮)
১৫	ঝুমি রানী দাস (সদস্য নং ১১৭০)	৩০	মো. হাসিব মাহমুদ (সদস্য নং ১২০৩)

অভিনন্দন!

শিউলী খাতুন

শিউলী খাতুন (সদস্য নং ৭৪৩/২০০৮) সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে এমএসএস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বিএসএস (স্নাতক) পরীক্ষাতেও সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকর করেছিল। শিউলী খাতুন লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা থানার আলিমুদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০১০ সালে মানবিক বিভাগে জিপিএ ৫.১০ সহ এইচএসসি এবং এর আগে একই উপজেলার কেতকীবাড়ী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে মানবিক বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

রমজানুল মোবারক লিখন

'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা' সারা দেশ থেকে প্রতিভাধর ছাত্র-ছাত্রী (ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি) খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি উদ্যোগ যা ২০১৩ সালে চালু করা হয়। গণিত ও কম্পিউটার; বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ; ভাষা ও সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এ চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গফরগাঁও সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ-এ দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেধা লালন গ্রুপের ২০১৬ ব্যাচের সদস্য রমজানুল মোবারক লিখন 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৭' এ 'বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে গফরগাঁও উপজেলা হতে বছরের সেরা মেধাবী হিসেবে বিজয়ী হয়েছে। তাঁর এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

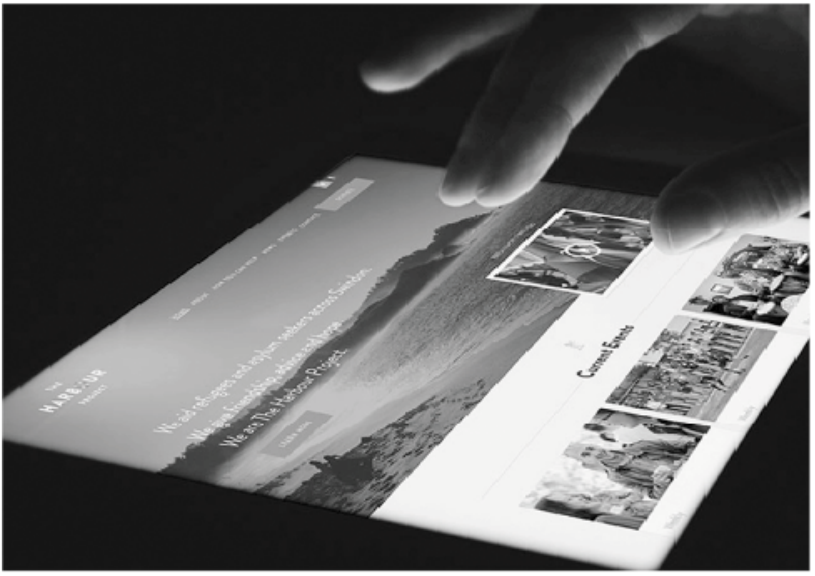

ওয়েব ডিজাইন কী? কেন শিখবেন? কী কী শিখবেন? কীভাবে কাজ করবেন?

ওয়েব ডিজাইন কী?

ওয়েব ডিজাইন মানে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে বা এর সাধারণ রূপ কেমন হবে তা নির্ধারণ করা। ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে আপনার কাজ হবে একটা পূর্ণাঙ্গ ওয়েব সাইটের টেম্পলেট বানানো। যেমন ধরুন এটার লেআউট কেমন হবে। হেডারে কোথায় মেনু থাকবে, সাইডবার হবে কিনা, ইমেজগুলো কীভাবে প্রদর্শন করবে ইত্যাদি। ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে ওয়েবসাইটের তথ্য কী হবে এবং কোথায় জমা থাকবে এগুলো চিন্তা না করে, তথ্যগুলো কীভাবে দেখানো হবে সেটা নির্ধারণ করাই হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনারের কাজ। আর এই ডিজাইন নির্ধারণ করতে ব্যবহার করতে হবে কিছু প্রোগ্রামিং, স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ।

কেন শিখবেন ওয়েব ডিজাইন?

আমাদের দেশে মূলত লোকজন 'কোন কাজটা আমি শিখব' বা 'আমি কোন কাজটা পারব' এধরনের প্রশ্ন না করে বরং বলে 'কীভাবে সহজে আয় করব' বা 'এটা শিখে কত টাকা আয় করব'। যারা আয় কত করবেন বা রাতারাতি কীভাবে আয় করবেন এইসব চিন্তা করেন তাদের জন্য ওয়েব ডিজাইন নয়। যদিও ওয়েব ডিজাইন আসলে উচ্চ আয়ের পেশার মধ্যে অন্যতম কিন্তু আপনি যদি আয়ের কথাটাই মাথায় রেখে এগুতে চান তাহলে আমি বলব আপনার জন্য ওয়েব ডিজাইন নয়। ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন বা প্রোগ্রামিং এই ধরনের পেশা আসলে তাদের জন্য যারা ক্রিয়েটিভ কিছু করতে চান এবং নিজের কাজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পেতে চান। ওয়েব

ডিজাইন যেহেতু কোডিং এবং প্রোগ্রামিং এ ভরপুর আর প্রোগ্রামিং-এর নেশা ছাড়া প্রোগ্রামিং করা সম্ভব নয় তাই এধরনের কাজ শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা এই কাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে শিখে যাওয়ার পর আপনি অন্য যেকোনো পেশা থেকে এখানেই ভালো আয় করতে পারবেন।

কী কী শিখতে হবে?

ওয়েব ডিজাইন বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে মোটামুটি কয়েক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে করা হয়ে থাকে আবার শুরুতে ফটোশপ ব্যবহার করে প্রথমে এটার ঘটন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃতগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

এইচটিএমএল (HTML) : HTML একটি মার্কআপ ভাষা। ব্রাউজার কোন একটা সাইটের ভিউয়ার যা দেখতে পায় তা এইচটিএমএল দিয়ে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, বরং যেকোনো প্রোগ্রামিং থেকে অনেক সহজ। এটা এতটাই সহজ যে–যেকোনো সাধারণ মানুষ যে প্রোগ্রামিং শিখতে চায় না, সেও হাসির ছলে ছলে HTML শিখে নিতে পারে। যেমন আমরা যদি কোনো একটা প্যারাগ্রাপ প্রদর্শন করতে চাই তখন এমন লিখতে হয়।

```
<p>This is a paragraph</p>
```

অর্থাৎ 'This is a paragraph' এই টেক্সট টুকো ব্রাউজার এ একটা প্যারাগ্রাপ হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

সিএসএস (CSS) : এটাও একটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটি নির্ধারণ করে দেয় ব্রাউজার জেই কন্টেন্ট HTML দ্বারা প্রদর্শিত হবে সেটা দেখতে কেমন হবে। অর্থাৎ লেখাটার ফন্ট কত বড় হবে। পাশে কতটুকু জায়গা খালি থাকবে। একটা লেখা থেকে আরেকটার দূরত্ব কতটুকু হবে, এটির রং কী হবে বেকগ্রাউন্ড কী হবে, এমনকি সর্বশেষ CSS3 দিয়ে কন্টেন্টে এনিমেশন ও যুক্ত করা যায়। যেমনঃ পূর্বে আমরা একটা HTML paragraph লিখেছিলাম। এখন আমরা চাইলে নিচের কোডটুকু দিয়ে সেই প্যারাগ্রাপ এর টেক্সট এর রং লাল করে দিতে পারি।

জাভাস্ক্রিপ্ট/জেকুয়েরি (javascript/jQuery) : এই দুটোকে মূলত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কিছুটা কাছাকাছি ধরা যায়। মূলত দুটি জিনিসের কাজ একি তবে জেকুয়েরি হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টেরই একটা রূপ যা সাইটে জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহারকে অনেকটাই সহজ করে। আর এগুলোর কাজ হচ্ছে সাইটটা ইন্টারেক্টিভ করা। অর্থাৎ ভিজিটর একটা বাটনে ক্লিক করলে মেনু ওপেন হবে। অথবা একটা ফর্ম সাবমিট করলে কনফার্মেশন মেসেজ দেখাবে ইত্যাদি।

মূলত কাজ শুরু করতে এই কয়েকটি ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষতা এবং বাস্তব কাজে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করলেই হবে। তবে এই ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা একটি চলমান প্রক্রিয়া। উত্তরোত্তর নতুন অনেক কিছু শিখে নিজেকে আরও প্রফেশনাল আরও যোগ্য ওয়েব ডিজাইনার করে তুলতে হবে।

কোথায় কাজ করবেন?

ফ্রিলান্স মার্কেটপ্লেসে ওয়েব ডিজাইন এবং ফ্রন্ট-ইন্ড-ওয়েব ডেভেলপমেন্টের প্রচুর কাজ পাওয়া যায় এবং এই ধরণের কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুলনামূলক কম তবে চাহিদা বেশি। তাই সহজে কাজ পাবেন এবং এধরনের কাজের দামও বেশি। একজন সাধারণমানের ফ্রিলান্সারের ঘন্টাপ্রতি কাজ করার রেট হয় ২ ডলার, কিন্তু একজন ওয়েব ডিজাইনার এর ঘন্টাপ্রতি রেট শুরুতেই ১০ বা ১২ ডলার হয়ে থাকে। তবে অনেকের ধারণা ওয়েব ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট শিখলে শুধু ফ্রিলান্স করতে হবে এবং না করলে আয় বন্ধ, তাদের জন্য বলছি, themeforest.net এবং এধরনের অনেক মার্কেট আছে যেখানে ওয়েব টেম্পলেট এবং ওয়েব ইলিমেন্ট খুবই ভালো দামে বিক্রি করা যায়। এক্ষেত্রে আপনি আপনার একটি ডিজাইন করা টেম্পলেট বহুবার বিক্রি করতে পারবেন এবং কোয়ালিটি ভালো হলে প্রতিমাসে একেকটা টেম্পলেট এর আয় দিয়েই আপনি রাজার হালে চলতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ যা বলা উচিত তা হচ্ছে, ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার হতে হলে যেমন আপনার প্রচুর ধৈর্য আর সময়ের দরকার তেমনি আবার শিখে নিলে এটাই হচ্ছে উচ্চ আয়ের এবং সম্মানজনক পেশা।

softnetbd.com

যে চ কারণে আমড়া খাবেন

আমড়া সুস্বাদু ও সহজপ্রাপ্য একটি দেশি ফল। এটি থেকে আচার, চাটনি ও জেলি তৈরি করা যায়। আমড়া তরকারি হিসেবে রান্না করেও খাওয়া যায়। দামে সস্তা হলেও মুখে রুচি বৃদ্ধিসহ অসংখ্য গুণাগুণ রয়েছে এ ফলের।

গোল্ডেন আপেলখ্যাত আমড়ায় জলীয় অংশ ৮৩.২, খনিজ ০.৬, লৌহ ০.৩৯, আঁশ ০.১, চর্বি ০.১, আমিষ ১.১, শর্করা ১৫, ক্যালসিয়াম ০.৫৫ শতাংশ। এবার আসুন আমড়ার কিছু পুষ্টিগুণ বিষয়ে জেনে নিই–

১. ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ : ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের রোগ, মাংসপেশীর খিচুনিসহ অনেক রোগ হতে পারে। তাই প্রতিদিনের ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণে আমড়ার খাওয়া যেতে পারে।

২. ত্বক ভালো রাখতে : ত্বকের ব্রণ কমাতে এবং ত্বক সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখতে আমড়া দারুণ উপকারী। আমড়ায় প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে, যা ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।

৩. রক্তস্বল্পতা রোধে : আমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে, যা রক্তস্বল্পতা রোধে কার্যকরী। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও ঠিক রাখে।

৪. বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে : আমড়য় বিভিন্ন দ্রবণীয় ফাইবার রয়েছে, যা পাকস্থলীর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখে। তাই বদহজম, পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগ থেকে বাঁচতে নিয়মিত আমড়া খেতে পারেন।

৫. সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে কাজ করে : আমড়া বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। তাই আমড়ার সিজনে প্রতিদিন এই ফল খেলে আপনি নানান সংক্রমণ থেকে সহজেই রক্ষা পেতে পারেন।

৬. ক্যান্সার প্রতিরোধ করে : আমড়ায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফলে সহজেই সুস্থ থাকা সম্ভব হয়।

৭. রুচি বাড়ায় : অসুস্থ ব্যক্তিদের মুখের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে আমড়ার দারুণ কার্যকর। আমড়া খেলে মুখের অরুচিভাব দূর হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। তাই রুচি বাড়াতে নিয়মিত ফলটি খাওয়া যেতে পারে।

৮. স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় : আমড়া রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। তাহ আমড়া খেলে স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা দাঁত ও মাড়ির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে।

সমকাল, অনলাইন ডেস্ক ২০ অক্টোবর ২০১৭

অভ্যাস পরিবর্তনের ১০টি উপায়

পরিবর্তন এর কথা শুনলেই আমাদের ক্যামন যেন জ্বর চলে আসে। সামনে না বললেও ভিতরে ভিতরে পচে মরতে হয়। তবে কিছু অভ্যাস থাকে যা আমরা অনেকেই পরিবর্তন করতে চাই, কিন্তু হয়ে ওঠে না। অভ্যাস আসলে কী? অভ্যাস হলো আমাদের নিয়মিত করা কিছু কর্মকাণ্ড যা নিয়ে আমরা ভাবি না। এবার এসব অভ্যাসের পরিবর্তন বলতে শুধু খারাপ অভ্যাসগুলোকে ঝেড়ে ফেলা নয়, বরং শত খারাপের মাঝে কিছু ভালো স্বভাব অভ্যাসে পরিণত করা–যেমন যেখানে সেখানে কিছু না ফেলা, বই পড়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা কিংবা হাঁটতে যাওয়া–এছাড়াও আরও অনেক কিছু যা আপনার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাই দেখে নিন অভ্যাস পরিবর্তনের ১০টি উপায় :

১. লেগে থাকুন : অভ্যাস পরিবর্তনের প্রথম শর্ত হলো লেগে থাকা। এর মানে এই না যে আপনাকে ২৪ঘন্টা সেই কাজটাই করতে হবে। এর মানে কষ্ট করে হলেও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ধরুন আপনি চাইছেন প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে হাঁটবেন। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে আপনি হাঁপিয়ে ওঠেন এবং আধা ঘণ্টা পর বাড়ি চলে আসেন। তাহলে জীবনেও আপনার অভ্যাস পরিবর্তন হবে না। বরং একদিন আপনি আর হাঁটতে যাবেন না। আর সেটাই হবে আপনার অভ্যাস। তাই হাঁটতে গেলে আপনার উচিত হবে ২ঘন্টা হেঁটে তারপর ফেরা। মনে রাখবেন আমাদের মন আমাদের সবসময় বিভ্রান্তিতে ফেলে। হাঁটার সময় আপনার মনে হতে পারে আপনার খারাপ (অসুস্থ থাকলে ভিন্ন কথা) লাগছে কিংবা আজকে না পারলেও কালকে থেকে পারবেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল তা আপনি নিজেও জানেন। তাই অভ্যাস পরিবর্তনের খাতিরে লেগে থাকুন। শুধু হাঁটার জন্য নয় অন্য যেকোনো কাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য।

২. প্রতিজ্ঞা করুন : একবার না পারিলে দেখো শতবার–কথাটি আমরা সবাই জানি। তবে আমরা যা মানি তা হলো–আজিকে না পারিলে দেখো রবিবার। অর্থাৎ আমরা আগামীকালের জন্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত কাজটি ফেলে রাখি এবং সেই আগামীকাল আর কখনো আসে না। এভাবেই আমাদের অভ্যাসও পরিবর্তন হয় না। তাই আর আগামীকালের কথা না ভেবে যা ভাবছেন তা আজকেই শুরু করার জন্য প্রতিজ্ঞা করুন।

৩. নিজেকে উপহার দিন : দিন শেষে কিছু পেতে কার না ভালো লাগে? তবে সেই পাওয়া হোক অর্জনের বদলে। নিজেকে উপহার দিয়ে অভ্যাস পরিবর্তনে সাহায্য করুন।

৪. না বলতে শিখুন : আপনি একসাথে সবকিছুর জন্য তৈরি হতে পারবেন না। পারলেও দিনশেষে বলতে হবে, 'জ্যাক অফ ট্রেইটস, মাস্টার অফ নান।' অর্থাৎ কোনো কিছুতেই পারদর্শী না। অভ্যাসের বেলাতেও তাই। সব একসাথে পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন না। যে-কোনো একটা দিয়ে শুরু করুন এবং বাকি সবকিছুকে না বলুন। এমনকি যা আপনার অভ্যাস পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করবে সেটাকেও না বলুন।

৫. আস্থা রাখুন : শুরুতেই আপনি সাফল্য পাবেন তা ভেবে বসে থাকবেন না। নিজের উপর আস্থা রাখুন। সাফল্য আসবেই অর্থাৎ অভ্যাস পরিবর্তন হবেই। ক্ষেত্র বিশেষে সময় বেশি লাগতে পারে এই যা।

৬. শাস্তি দিন : বাচ্চারা ভুল করলে শাস্তি দেয়া হয় যেন তারা আর সেটা না করে। অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য আপনারও শাস্তির প্রয়োজন আছে। আপনি সকালে হাঁটতে যেতে চান অথচ আজ সকালে তা পারলেন না। এজন্য নিজেকে শাস্তি দিন যেন পরবর্তীতে এরকম আর না হয়। ভয়াবহ শাস্তি হতে পারে সারাদিন ফেসবুকে না ঢোকা।

৭. রুটিন তৈরি করুন : অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য একটা রুটিন থাকা প্রয়োজন কেননা রুটিন একটা নিয়ম তৈরি করে। আর নিয়ম ছাড়া কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নয়। তাই অভ্যাস পরিবর্তনের শুরুতেই একটা রুটিন করে ফেলুন এবং সেটা মেনে চলার চেষ্টা করুন।

৮. ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ : পরিবর্তন অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাছে হেরে যায়। আমরা ইচ্ছা করলেই যেটা পারি সেটাকে দূরে ঠেলে কী লাভ? আপনার ইচ্ছাশক্তিই আপনার অভ্যাস পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি।

৯. পরামর্শ নিন : সবকিছু ঠিক আছে মনে হলেও কিছু না কিছু বাকি থেকে যায় এবং আমাদের অভ্যাসের আর পরিবর্তন ঘটে না। এমন মনে হলে কারো কাছে পরামর্শ নিন।

১০. প্রশ্ন করুন : দিনশেষে নিজেকে প্রশ্ন করুন। কেননা আপনিই আপনার বিচারক। যদি উত্তরে সন্তুষ্ট হন তবে চালিয়ে যান। নতুবা নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন এবং অভ্যাস পরিবর্তনে নিজেকে সাহায্য করুণ।

কিছু খারাপ অভ্যাসের কারণে আপনি সবার থেকে দূরে সরে যেতে পারেন। আবার কিছু ভালো অভ্যাস আপনার জীবনকে সুন্দর করে তুলবে। তাই এখনই পরিবর্তনের চেষ্টা করুন অভ্যাস।।

□

সুস্মিতা সেন
পিপীলিকা বাংলা গ্রুপ ২১ নভেম্বর ২০১৭

যে চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশে বিদেশি রোগী

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে নেতিবাচক খবরে যখন মিডিয়া সয়লাব! উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের মানুষ পাগলের মতো যখন ছুটে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে। ঠিক তখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা নিতে আসছে বাংলাদেশে! হ্যাঁ, বাংলাদেশের ডাক্তারদের কাছেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মতো দেশ থেকে রোগীরা আসছেন ক্রনিক হেপাটাইটিস এর চিকিৎসা নিতে!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মামুন আল মহতাব (স্বপ্নীল) ও জাপন প্রবাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর বাংলাদেশে সফল হেপাটাইটিস চিকিৎসার নেপথ্য কারিগর। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেপাটাইটিস চিকিৎসার সাফল্য সম্পর্কে ডা. স্বপ্নীলের দেয়া বর্ণনা 'প্ল্যাটফর্ম' নামক ওয়েবপোর্টালে তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মারুফুর রহমান অপু।

'নাসভ্যাক' (Novel Nasal Vaccine for Hepatitis B বা NASVAC)। বাংলাদেশি চিকিৎসকদের উদ্ভাবিত প্রথম নিউ ড্রাগ মলিকিউল যেটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নানা ধাপ পেরিয়ে শেষ ধাপে আছে। বর্তমানে কিউবাসহ পৃথিবীর আরো কিছু দেশে ইতিমধ্যে বাজারজাত শুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের FDA এবং বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে 'নাসভ্যাক' এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালিয়ে দেখা গেছে ন্যাসভ্যাক প্রয়োগে ৬ মাসে ৫৯% হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের কারণে ক্রনিক হেপাটাইটিসে আক্রান্ত রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

প্রচলিত স্বীকৃত ওষুধ পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন প্রয়োগে অরোগ্য পেয়েছেন ৩৮ শতাংশ রোগী। বর্তমানে ওষুধটি জাপানে মাল্টি সেন্টার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আছে। প্রয়োজনীয় আইন না থাকায় এটি এখনো বাংলাদেশে প্রস্তুত করা যায়নি তবে আগামী ২-১ বছরের মাঝেই এটি বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখানেই সাফল্যের গল্পের শেষ নয় যদি বলি এদেশেই স্টেম সেল থেরাপী দেয়া হচ্ছে! হ্যাঁ, ডা. সপ্নীল ও তার দল বাংলাদেশেই স্টেম সেল থেরাপীর মাধ্যমে লিভার সিরোসিস বা ফেইলিউর হয়ে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসা শুরু করেছেন।

লিভার সিরোসিস ব ফেইলিউর হওয়া অধিকাংশ রোগী মৃত্যুবরণ করেন এবং এর প্রচলিত চিকিৎসা লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট। যাতে খরচ প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ টাকা আর উপযোগী ডোনার পাওয়াও কষ্টসাধ্য।

কিন্তু স্টেমসেল পদ্ধতিতে চিকিৎসা খরচ মাত্র ৫০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা। স্টেম সেল ব্যবহারের পদ্ধতিটি নতুন না হলেও ডা. স্বপ্নীল ও তার দল নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সরাসরি লিভারের আর্টারিতেই স্টেম সেল প্রয়োগ করছেন এবং এ প্রক্রিয়া ৩ জন রোগীর উপর প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে সাফল্য পেয়েছেন।

আর একটি বিষয় জানা দরকার যে, হেপাটাইটিস-বি এর পাশাপাশি হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসও লিভার নষ্ট হয়ে মারা যাবার অন্যতম কারণ। বহির্বিশ্বে এই রোগে ব্যবহার্য ওষুধের মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ডলার! কিন্তু বাংলাদেশে সেই একই ওষুধের মূল্য কত জানেন? মাত্র ১ হাজার ডলার! তৈরি করছে ইনসেপ্টা এবং বিকন।

মূল একটিভ মলিকিউল তৈরি করা কোম্পানি বাংলাদেশ ও ভারতে এই ওষুধ তৈরির অনুমতি দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত পেটেন্ট রেস্ট্রিকশন পাওয়ায় এখানে এই ওষুধের দম ভারতের চেয়ে কম। তাই বহির্বিশ্বের প্রচুর রোগী এই ওষুধ নিতে সরাসরি বাংলাদেশে আসছেন কিংবা অনলাইনে অর্ডার করে নিচ্ছেন।

সূত্র : চ্যানেল আই অনলাইন.কম।

॥ এস এম আশিকুজ্জামান
২৯ জুলাই ২০১৭

আবেদন

ভিক্টর মন্ডল
সদস্য নং ১০৮০/২০১৩

দাও মোরে অবসর শান্তি ধারা আঁখি পর
কর বরষণ।
সমস্ত আশালয়ে জীবন যাচ্ছে বয়ে
চলছে এ নিখিল ভুবন।

কত হাসি কত কান্না কত হীরা কত পান্না
রয়েছে দাঁড়ায়ে।
সবকিছু নিভে যাক ফুরাক সকল বাঁক
তব হাত দাও বাড়ায়ে।

নিভৃত শ্যামল আঁখি শুধু করে ডাকাডাকি
শুধু যেন মন আকুলায়।
তৃষ্ণার্ত কাকের মতন খুঁজে ফিরি সবক্ষণ
চোখে যেন আজ শুধু বিজলী মেলায়।

কত করবীর বন শুধু আকুলায় মন
দেহে যেন আগুনের ছটা,
কত না সখীর মেলা মোরে করে হেলা
এমনই ঘনার ঘটা।

এমনই গো চিরকাল সব করে অন্তরাল,
ধুলাতে যে যায় গড়াগড়ি–
আপন অন্তরে আসি তারে কত ভালোবাসি,
আপনারে লই আজ কাড়ি।

আমার দুপুরবেলা কত গান কত খেলা,
মিলায় আঁখি পরে–
সব পুড়ে হোক ছাই এত গান নাহি চাই–
তব হাত ধরি আপন করে।

তবু তুমি যাও হেসে সকল চাওয়া ধুলায় মেশে,
জীবনে বয়ে চলে তরী–
নাহি হয় অবসান ঐ হাসি ঐ গান
আপন জ্বালায় আজ মরি।

তখন গো বরিষণে তোমারেই ভাবি মনে,
তুমি ওগো বড় স্বার্থপর।
ভালোবেসে সব নিয়ে এই আকুল হিয়ে
আজ মোরে করিয়াছ পর।

দিনে দিনে অবসান ফুরাল সকল গান,
আজি ভরা এ বেলায়–
সকল বেসুরো সুর সব লাগে সুমধুর,
পড়িয়াছি তব যে হেলায়।

এমনই যে দিন কত পার হয়ে গেছে শত,
ফিরিতেছি আজ দ্বারে দ্বারে–
ভরিয়া যে ওঠে মন,
সবাই ফিরায় বারে বারে।

এদিন ফুরাবে যবে সকলই তোমার হবে,
যা কিছু আছে আজ মোর–
সবকিছু দেব ছেড়ে নিতে হবে না কেড়ে,
সকলই শূন্য হবে মোর।

যে দিন বুঝিবে তুমি কত জ্বালা কত সহি,
দিয়াছ এ বক্ষ পরে ঢালি–
তোমাদান বক্ষে লয়ে জীবন গিয়েছে ক্ষয়ে,
হৃদেতে আজো আছে সেই বহ্নির কালি।

নও তুমি স্বার্থপর সবই নেবে আপন কর,
সব ক্ষত হবে নিবারণ–
শান্তির অশ্রুবারি জয় হবে আমারই,
দেবে ঢালি অমৃত আভরণ।

তোমারে জড়ায়ে ধরে অশ্রুবারি বক্ষ পরে,
বলব, তোমারেই ভালোবাসি।
পড়ব চরণ পরে তুলি নেবে আপন করে,
বাহুডোরে নেবে তুমি আসি।

তোমারই চরণ পরে প্রাণ পাখি ঘুরে মরে,
ছাড়িয়া যাবে তুমি কিসে?
তোমারে জড়ায়ে ধরে লুকাব মুখ তব বক্ষ পরে,
সেদিন যাব ওগো তোমাতে যে মিশে।

প্রকল্প সংবাদ

পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প কী এবং কেন?

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে 'পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প' অন্যতম একটি। পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা যেন নিয়মিত পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার মাধ্যমে নিজ সমাজ, দেশসহ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতা, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার, জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন দর্শন প্রভৃতি বিষয় পড়তে ও জানতে পারে এবং জ্ঞানের এই আনন্দময় চর্চার মাধ্যমে আলোকিত ও মুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এ লক্ষ্যে তৎকালীন বিসিসি ফাউন্ডেশন ১৯৮৬ সালে প্রকল্পটি চালু করে। পরবর্তীকালে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পরও এটি অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্তির পর পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে ৫ বছর পর্যন্ত বই সরবরাহ করা হয় এবং পাঠাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে লাইব্রেরিয়ানশীপের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রকল্পের অর্জনসমূহ:

- এ যাবৎ সুবিধাপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা : ৪৫২
- মেয়াদ পূর্তি স্কুলের সংখ্যা : ৩৫২
- বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত স্কুলের সংখ্যা : ১০০টি
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ১২টি ব্যাচ
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা : ৪৬৮ জন
- এ যাবৎ বিতরণকৃত বইয়ের সংখ্যা : ২১,০৮,০৬২

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১২

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	জান্নাতুন্নেছা বৃষ্টি, ৯৬৫/২০১২ গ্রাম: আঁচাভুয়া, ডাকঘর: চালনাবাজার, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বি.ফার্ম. (অনার্স), ফার্মেসি, ৩য় বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
২.	তৌফিকা আহমেদ টুম্পা, ৯৬৭/২০১২ স্টেশন মসজিদ সংলগ্ন (পিছনে), রাঘাইচটি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	বিএসসি এজি, কৃষি, ২য় বর্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৩.	খাতুনে জান্নাত, ৯৬৮/২০১২ গ্রাম: শেখ সরদার পাড়া, ডাকঘর: উত্তর বেদকাশী, উপজেলা: কয়রা, জেলা: খুলনা।	বিএসসি, মাৎস্যবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৪.	স্বর্ণালী বাছাড়, ৯৬৯/২০১২ চালনা, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বিএসসি, গণিত, ৩য় বর্ষ সরকারি পি.সি. কলেজ, বাগেরহাট।
৫.	ছাবিকুন নাহার ছন্দা, ৯৭১/২০১২ দীঘিরপাড়, গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ।	বিএসসি. ইঞ্জি, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় বর্ষ রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী।
৬.	আনার কলি আক্তার, ৯৭২/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: দুলালকান্দী, উপজেলা: বেলাব, জেলা: নরসিংদী।	বিএসএস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
৭.	রাইসা শোয়েব খুশবু, ৯৭৩/২০১২ ১২ নং দুর্গাবাড়ী রোড, ওয়ার্ড নং- ৮, ময়মনসিংহ।	বিএসসি, কৃষি, ২য় বর্ষ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
৮.	মাহমুদা ইয়াছমিন মুনিয়া, ৯৭৪/২০১২ গ্রাম: চরকৈলাশ, ৫নং ওয়ার্ড, ডাকঘর ও উপজেলা: হাতিয়া, জেলা:নোয়াখালী।	এমবিবিএস, ৪র্থ বর্ষ শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।
৯.	ফাহমিদা বিনতে আলম, ৯৭৫/২০১২ গ্রাম: আমুয়াকান্দা, ডাকঘর ও উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ।	বিএসসি এ.এইচ, পশুপালন অনুষদ, ৩য় বর্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১০.	আরিফা আক্তার রিমা, ৯৭৬/২০১২ গ্রাম: খালিশা কালোয়া, ডাকঘর: হলোখানা, উপজেলা ও জেলা: কুড়িগ্রাম।	বিএসসি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম।
১১.	মোসা. জোবাইদা খাতুন, ৯৭৭/২০১২ গ্রাম: খোসালপাড়া-২, ডাকঘর ও উপজেলা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বিএসসি, রসায়ন, ৩য় বর্ষ নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২.	তাছলিমা আক্তার, ৯৭৮/২০১২ গ্রাম: মির্জাপুর, ডাকঘর: আনুলিয়া, উপজেলা: আশাশুনি, জেলা: সাতক্ষীরা।	বিএসএস, ২য় বর্ষ, অর্থনীতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
১৩.	মিন্তা সাহা, ৯৭৯/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: চালনা বাজার, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	বিএস (অনার্স), ২য় বর্ষ ভূগোল ও পরিবেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪.	সিফাত আরা খানম, ৯৮০/২০১২ আহ্লাদ মঞ্জিল, মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস লেন, পুর্ব মজমপুর, কুষ্টিয়া।	ডিভিএম, ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিমেল সায়েন্স, ২য় বর্ষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৫.	ফাহিমা নুসাইফা, ৯৮১/২০১২ মহল্লা : বিশ্বাসপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা : জয়পুরহাট, জেলা : জয়পুরহাট।	বিএসএস, উন্নয়ন অধ্যয়ন ৩য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬.	সুমি আক্তার, ৯৮২/২০১২ গ্রাম: দক্ষিণ মরুয়াদহ, ডাকঘর: শোভাগঞ্জ, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা।	বিএসসি, গণিত, ২য় বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১৭.	সোমাইয়া আফরিন মিলি, ৯৮৩/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: মাইজবাড়ী, উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ।	বিএসসি, উদ্ভিদবিদ্যা, ২য় বর্ষ মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।
১৮.	মোছা. আরিফা খাতুন, ৯৮৫/২০১২ গ্রাম: পূর্ব বেজগ্রাম, ডাকঘর: নওদাবাস, উপজেলা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ আলিমুদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।
১৯.	মরিয়ম খাতুন, ৯৮৭/২০১২ গ্রাম: শিশার কুন্ড, ডাকঘর: কুল্যাপাছা, উপজেলা: কোটচাঁদপুর, জেলা: ঝিনাইদহ।	মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং কোর্স, ৪র্থ পর্ব মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ঝিনাইদহ।
২০.	মোছা. ফেরদৌসি আক্তার, ৯৮৮/২০১২ গ্রাম: মেকুরটারী, ডাকঘর ও উপজেলা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম।	বিবিএস, ব্যবস্থাপনা, ২য় বর্ষ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম।
২১.	উম্মে ছাওবিয়া, ৯৮৯/২০১২ গ্রাম: উত্তর হলদীবাড়ি, ডাকঘর: সিন্দুর্ণা, উপজেলা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি, রসায়ন, ২য় বর্ষ রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর।
২২.	ফারহানা নাজনীন, ৯৯০/২০১২ গ্রাম: কাপডাঙ্গা, ডাকঘর: কে.ডি. গোপালপুর, উপজেলা: কোটালিপাড়া জেলা: গোপালগঞ্জ।	বিএ, ইংরেজি, ৩য় বর্ষ ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর।
২৩.	মোছা. রেশমা খাতুন, ৯৯১/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: আগ্রান, থানা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর।	বিএ, বংলা, ২য় বর্ষ বড়াইগ্রাম অনার্স কলেজ, নাটোর।
২৪.	নাজনীন জাহান নিশি, ৯৯২/২০১২ গ্রাম: সুন্দরগাঁও, ডাকঘর: বাহেরঘাটি, উপজেলা: আগইলজারা, জেলা: বরিশাল।	বিবিএস, মার্কেটিং, ১ম বর্ষ ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
২৫.	মোসা. তোহরিমা খাতুন, ৯৯৩/২০১২ গ্রাম: খোসালপাড়া (২), ডাকঘর ও উপজেলা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বিএ (পাস), ২য় বর্ষ গোমস্তাপুর সোলেমান মিঞা ডিগ্রি কলেজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২৬.	তানজিলা আক্তার, ৯৯৪/২০১২ গ্রাম: হাঁসমারী, ডাকঘর: কাছিকাটা, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর।	বিএসএস, সমাজবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ বিলচলন শহীদ সামসুজ্জোহা কলেজ নাটোর।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

হীরা কি? হীরা এত দামি কেন?

হীরা! শব্দটি শোনামাত্রই আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল ধবধবে কোনো পদার্থের কথা! হীরা বলতে চোখের সামনে যে সাদা ধবধবে উজ্জ্বল বস্তু ভেসে ওঠে শুধু তাকেই বোঝায় না। এছাড়াও অন্য রঙের হীরাও আছে। হীরা আপাতত মানুষের জানা সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। শুধুমাত্র কার্বন দিয়েই তৈরি হয় হীরা। একটি হীরা পাথর তৈরি হতে সময় লাগে কয়েক বিলিয়ন বছর! চিন্তা করা যায়? এতো দীর্ঘসময়ের ফলাফল হিসেবে আমরা অল্প কিছু হীরা পাচ্ছি! সাদা হীরার পাশাপাশি কালো, সবুজ, নীল, বাদামী, হলুদ, লাল, গোলাপি, বেগুনী সহ আরো কিছু রঙের হীরা পাওয়া যায়!

হীরা কেবল সৌখিন বড়লোকদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে আছে, এর পিছনে কাজ করছে এর আকাশচুম্বী দাম! সামান্য একটু হীরার বাজারদর অনেক হতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২০৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকায় জেনেভায় বিক্রি হয়েছে আফ্রিকার বোতসোয়ানা খনি থেকে প্রাপ্ত একটি দুর্লভ নিখাঁত হীরা! এতো দাম কেন হীরার! হীরার দুর্মূল্যের পেছনে রয়েছে এর দুস্প্রাপ্যতা। পৃথিবীতে যেসব দুষ্প্রাপ্য পদার্থ রয়েছে তার মধ্যে হীরা অন্যতম। একটি হীরার দাম কেমন হবে তা নির্ভর করে তার প্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতার উপর, এর রঙের উপর, এটি কতটা নিখাঁত তার উপর, আর এর ঔজ্জ্বল্যের উপর। তবে ক্রেতারা অন্য সব কিছু ছাড়িয়ে ঔজ্জ্বল্যকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর সবচেয়ে মজার কথা হলো হীরার কোনো বিকার হয় না, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর পরেও হীরার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই।

Wi-fi কী ?

Wi-fi অথবা Wireless Fidelity একটি স্বাধীন নেটওয়ার্ক যা আপনাকে বাড়িতে, হোটেল রুম, কনফারেন্স রুম সর্বত্রই তারবিহীন অবস্থায় নেটওয়ার্ক (এরিয়াভিত্তিক অথবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক) জগতে প্রবেশের অনুমতি দেয়। সহজ ভাষায় Wifi হচ্ছে তারবিহীন ইন্টারনেট সুবিধা আপনি আপনার বাসায়/অফিস এ সুনির্ধারিত Wifi ব্যবহার করে ইন্টারনেট সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে তার portability। অধিকাংশ ল্যাপটপ এবং এন্ড্রোয়েড ফোনে আজকাল এই সুবিধা থাকে। Wifi নেটওয়ার্কের আওতাধীন থাকা অবস্থায় আপনি এই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি একই সাথে একই রুমে একাধিক ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন শুধুমাত্র একটি ডিভাইস ব্যবহার করে। এই ডিভাইসটিকে বলা হয় রাউটার।

এপেন্ডিক্স ও এপেন্ডিসাইটিস কী?

এপেন্ডিক্স : মন আমার দেহঘড়ি, সন্ধান করি বানাইয়াছেন কোন মেস্তরি...অনম ভইরা চলিতেছে।

আমাদের দেহঘড়ি বা শরীর নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কি সক্রিয় এবং প্রয়োজনীয়? না। কিছু অঙ্গ আছে যা বিবর্তনের ফলে আমাদের শরীরে রয়ে গেছে কিন্তু সেগুলো কোনো শারীরিক ভূমিকায়

অবদান রাখে না। আমাদের শরীরের তেমনি এক নিষ্ক্রিয় এবং অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের নাম এপেন্ডিক্স পরিপাকতন্ত্র আমাদের খাদ্য হজম এবং রেচনে সাহায্য করে। পরিপাকতন্ত্রের দুইটা অংশ, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদান্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র। এবং বৃহদান্ত্র এর মাঝে অবস্থিত একটি বড় সিকামই হলো এপেন্ডিক্স। যদি কোনো কারণে এই সিকামটি পঁচে যায় তবে তীব্র ব্যথাসহ নানান রকমের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এপন্ডিসাইটিস : এপেন্ডিসাইটিস একটি রোগের নাম। এপেন্ডিক্সে তীব্র ব্যথার কারণে সৃষ্ট এই রোগের নাম এপেন্ডিসাইটিস। মল, কৃমি বা অন্য কিছু দ্বারা এপেন্ডিক্সের নালীমুখ বন্ধ হয়ে গেলে এতে পঁচন ধরে। আর পঁচনের ফলে তীব্র ব্যথার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ভাইরাস অথবা আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহের কারণে এপেন্ডিক্সের গাত্র ফুলে উঠে এবং রক্ত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। এতে এপেন্ডিক্সে পঁচন ধরে ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। প্রদাহজনিত এই ব্যথা প্রথমদিকে নাভীর পোঁড়ার দিকে অনুভব করা যায়। পরে তলপেটের ডানদিকে সরে যায়। আপনার নাভীর পোঁড়ায় কোনো রকমের ব্যথা অনুভূত হলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। যেহেতু এপেন্ডিক্স মানবশরীরের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ। তাই অপারেশন করে কেটে ফেলতে একটুও ভয় পাবেন না।

গাড়ির নাম্বার প্লেটে আলাদা আলাদা বর্ণ ও নম্বর কী অর্থ বহন করে?

পৃথিবীর সব দেশেই নিজস্ব পদ্ধতিতে গাড়ির নাম্বার প্লেট সিস্টেম চালু রেখেছে। সকল সরকারি বা বেসরকারি যানবাহনে নাম্বার প্লেট ব্যবহারের এই নিয়ম চালু হয় ১৯৭৩ সালে। আমরা নাম্বার প্লেট শুধু নাম্বারটি দেখি, কিন্তু এর অর্থ বোঝার চেষ্টা কমই করি। বাংলাদেশে সাধারণত বাংলা বর্ণবালার অ, ই, উ, এ, ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ত, থ, ঢ, ড, ট, ঠ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, স, হ অক্ষরগুলো ব্যবহার করা হয়। উপরের প্রতিটি বর্ণ আলাদা গাড়ির পরিচয় বহন করে। যেমন : ৫০ সিসি পর্যন্ত মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে 'এ' ব্যবহার করা হয়। ১০০০ সিসি পর্যন্ত 'ক', এর উপরের সিসির জন্যে 'খ' বর্ণ ব্যবহার করা হয়।

নাম্বার প্লেট অনেক মজার তথ্য বহন করে যা আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই। বাংলাদেশের যানবাহনগুলোর নাম্বার প্লেট ফরম্যাট হচ্ছে 'শহরের নাম-গাড়ির ক্যাটাগরি ক্রম এবং গাড়ির নাম্বার' যেমন, 'ঢাকা মেট্রো য-১১২৫৯৯। এখানে, 'ঢাকা মেট্রো' দ্বারা বোঝানো হয়েছে গাড়িটি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আওতাধীন। 'য' হচ্ছে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গাড়ির চিহ্নকারী বর্ণ। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সব গাড়ি 'য' বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। পরবর্তী '১১' হচ্ছে গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং '২৫৯৯' হচ্ছে গাড়ির সিরিয়াল নাম্বার।

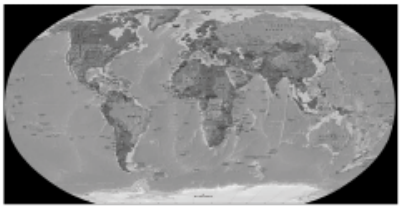

কেমন করে গোনা হলো পৃথিবীর বয়স?

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই আমাদের আবাসভূমি মানুষের মনে জন্ম দিয়ে আসছে বিচিত্র সব প্রশ্নের। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো–পৃথিবীর বয়স কত? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। কারো মতে, পৃথিবী আদি ও অনন্ত, এর কোনো সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। কিন্তু বিরোধীরা বলেছেন অন্য কথা। তাঁদের মতে, পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং এক সময় তা ধ্বংসও হয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর অসীমত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর মোটামুটি নির্ভুল একটা বয়স নির্ণয় করতেও সক্ষম হয়েছে। তা হলো ৫০০ কোটি বছর। পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের মতো একটা অকল্পনীয় কাজকে বাস্তবায়ন করতে মূল ভূমিকা পালন করেছে ইউরেনিয়াম। মানে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ধর্ম ব্যবহার করা হয় এই পরীক্ষায়। কেবলমাত্র পৃথিবীর বয়স নয়, লক্ষ লক্ষ্য বছরের পুরোনো কাঠ, হাজার হাজার বছর আগে মৃত প্রাণীর কঙ্কাল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদির বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় মৌলের এই তেজস্ক্রিয় ধর্ম।

বাংলা ভাষার বয়স কত?

খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ প্রান্তে এসে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে যে আধুনিক ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটে, তাদের মধ্যে বাংলা একটি। কোনো কোনো ভাষাবিদ তারও অনেক আগে, ৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে, বাংলার জন্ম হয় বলে মত পোষণ করেন। বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : ১. প্রাচীন বাংলা (৯০০/১০০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ), ২. মধ্য বাংলা (১৪০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ৩. আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে)।

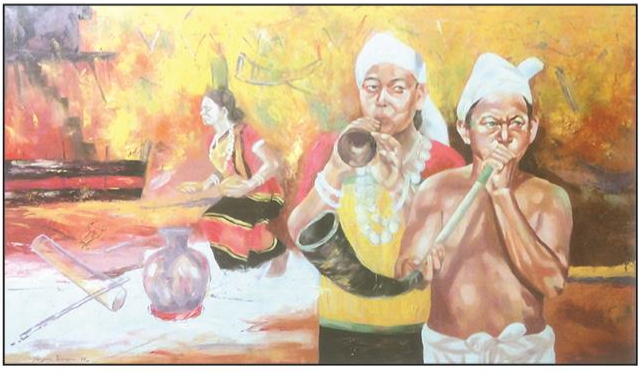

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

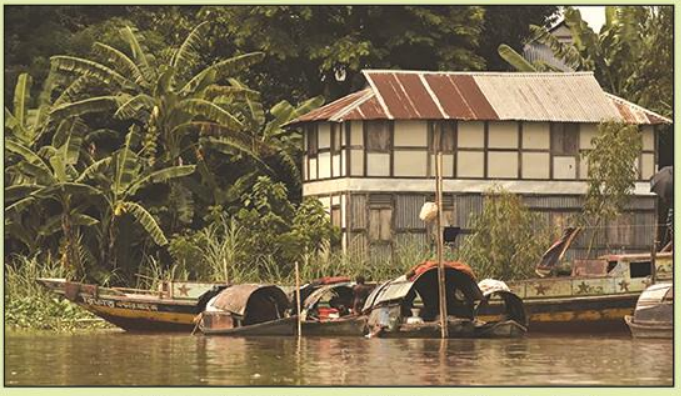

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, রুক-বি, কীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন